নব পর্য্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আবদুল ওদুদ

মূল্য বারো আনা

প্রকাশক
সৈয়দ ইমামুল হোসেন
মডার্ণ লাইব্রেরী
৭৪নং নবাবপুর, ঢাকা

১৩৩৬

Printed by S. A. Gunny,
at the Alexandra S. M. Press, Dacca.

সূচী

নব পর্য্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড

নেতা রামমোহন

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধেয় সভ্যাবৃন্দ,

প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিবাসরে তাঁর প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা-নিবেদনের সঙ্গী হতে আপনারা আমাকে আহ্বান করেছেন, এর জন্য আপনারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। বাংলার সেই পুরুষ-কারের মূর্ত্ত-স্বরূপের, মুক্তি-মন্ত্রের মহা-উদ্‌গাতার, প্রতি আমি হৃদয়ে যে শ্রদ্ধা বহন করি কথায় তা যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারবো কি না বল্‌তে পারি না; কিন্তু এ কথাটি আপনারা বিশ্বাস করবেন যে রাম-মোহনকে ও তাঁর প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্ম আন্দোলনকে সমস্ত অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করতে পেরেছি বলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ জ্ঞান করি।

বৃক্ষঃ ফলেন পরিচীয়তে—রামমোহনের মনুষ্যত্বের ও মুক্তি-সাধনার মাহাত্ম্য কত তাও চীৎকার ক'রে বল্‌বার দরকার করে না। তাঁর প্রচারের পর শত বৎসর গত হয়েছে, এই একশত বৎসরের বাংলার

ইতিহাসের উপর চোখ বুলিয়ে গেলে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় আপনি সে-মাহাত্ম্যের পরিমাপ হয়। এই শত বৎসরে বাংলার মানুষ সর্ব্বস্ব-পণে সত্যের সাধনা করেছে; জীবনের প্রকৃত আস্বাদ লাভের জন্য, প্রকৃত রূপ দেখে নয়ন সার্থক করবার জন্য, অতি নির্ম্মম হ'য়ে প্রাচীন সংস্কারকে আক্রমণ করেছে;—মানবাত্মার সেই সংগ্রামের সাম্‌নে মস্তক আপনি নত হ'য়ে আসে! সত্য-সাধনার এই কি স্বরূপ নয়? কোনো এক যুগে মানুষ সত্য-সাধনা করেছে, তারপর সেই অতীত সাধনার রোমন্থন ক'রেই মানুষের চলে বা চল্‌তে পারে, মানুষের ঘৃণিত অধঃপতন ও শোচনীয় আধ্যাত্মিক আত্ম-হত্যার সাক্ষ্যে বারবার কি এ-কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় নাই? পণ্যদ্রব্যের মতো সত্য কোথাও কিন্‌তে পাওয়া যায় না—না শাস্ত্রের কাছ থেকে, না গুরুর কাছ থেকে,—বৃক্ষে পুষ্পোদ্‌গমের মতো পরম বেদনায় মানবজীবনের ভিতর থেকে তার জন্ম হয়, মানুষের জীবনে এই মহা-সৃষ্টিতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য এই শত বৎসরের বাংলার ইতিহাসে আমাদের ঘটেছে!—আর কে না আজ জানে সেই সৌভাগ্যের জন্য কোন্ পরম ভাগ্যবানের কাছে আমরা ঋণী!

কিন্তু রামমোহনের যে গভীর তপস্যা, কালের পটে মানবতার যে নব চিত্রাঙ্কণ প্রয়াস, এই শত বৎসরের বাংলার ইতিহাসে তার আংশিক পরিচয়ই আমাদের সাম্‌নে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, পূর্ণ পরিচয়ের উদ্‌ঘাটনের ভার ন্যস্ত রয়েছে ভবিষ্যতের উপর। প্রধানতঃ দুটি কথা ভেবে এ কথা বল্‌ছি। প্রথমতঃ, রামমোহনের যে মুক্তি-মন্ত্র তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-অভিমানী বাঙালীর কণ্ঠে আজ তা আর উদাত্ত সুরে বিঘোষিত হচ্ছে না; দ্বিতীয়তঃ, রামমোহনের আত্মীয়-গোষ্ঠীর এক বড় শাখা, অর্থাৎ মুসলমান-সম্প্রদায়, তাঁর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আজো সচেতন হ'য়ে ওঠে নাই।

রামমোহনের বিরাট চিত্ত হিন্দু মুসলমান এই দুই প্রবল ভাবধারার সঙ্গমস্থল ছিল। হিন্দু সেই মহাতীর্থে স্নান ক'রে কিছু শক্তি ও শ্রী অর্জ্জন করেছে। এ তীর্থ যে মুসলমানেরও শক্তি ও শ্রী লাভের জন্য অমোঘ, শীঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক, মুসলমানকেও একথা স্বীকার কর্‌তে হবে।

কেন এ কথা বল্‌ছি তা একটু বিস্তৃতভাবে বল্‌লে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।—পরিবর্ত্তন জগতের নিয়ম। সে-পরিবর্ত্তন যে শুধু মানুষের কথা বার্ত্তা সাজ-সজ্জা ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়, মানুষের মত বিশ্বাস, সাহিত্য ধর্ম্ম, এ সমস্তেও তা বর্ত্তে। কিন্তু জীবনে পরিবর্ত্তনের শাসন স্বীকার কর্‌লেও মুখে তা স্বীকার কর্‌তে মানুষের দেরী হয়; এ স্বাভাবিক; মানুষের জীবন তার কথার আগে চলে। কিন্তু দেরী হ'লেও যে-সমাজ সভ্যতার দাবী করে, অন্যান্য সভ্য সমাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে বেঁচে থাকতে চায়, তার পূর্ণভাবেই পরিবর্ত্তনের শাসন স্বীকার ক'রে নেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তাই আধুনিক কালের সঙ্গে মুসলমানের যখন সম্যক্ পরিচয় হবে, এবং সেই পরিচয়ের প্রভাবে এক নূতন দৃষ্টিতে সে তার প্রাচীন শাস্ত্র ও সভ্যতার প্রতি চাইতে বাধ্য হবে, তখন বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় সে দেখ্‌বে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা দেশের এই মহাপুরুষ ইস্‌লাম ও মুসলমানের অনেক-কিছু উপাদানরূপে ব্যবহার ক'রে আধুনিক জীবনের প্রয়োজনে কি এক গৌরবময় নবসৃষ্টির ভিত্তি পত্তন করেছেন,—এবং সেই দিক দিয়ে আধুনিক মুসলমানদের তিনি কিরূপ একজন অগ্রবর্ত্তী নেতা।—ভিন্ন সমাজের লোক হ'য়েও রামমোহন যে এই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিলেন তার আংশিক কারণ, আত্মপ্রকৃতির ধর্ম্মে হজরত মোহম্মদের চরিত্রের প্রতি তিনি আকৃষ্ট ছিলেন;

আর ইসলামের ইতিহাসে যা-কিছু মূল্যবান যা-কিছু স্মরণীয়,—যেমন কোরআন, হজরত মোহম্মদের জীবনী ও বাণী, মোতাজেলা দর্শন, সুফি সাহিত্য, মুসলমানী সভ্যতা—এ সমস্তের সঙ্গে তাঁর অতি গভীর পরিচয় ছিল, এমন গভীর যে তার সাহায্যে কোনো-কিছুকে সম্পূর্ণ নিজস্ব ক'রে নেওয়া যায়। তাই হিন্দু যেমন রামমোহনকে ব্রহ্মবাদী ঋষির উত্তরপুরুষ ব'লে গণ্য করেছেন, মুসলমানও তেম্‌নি একদিন তাঁকে 'তৌহীদ'-মন্ত্রী সাম্যবাদী হজরত মোহম্মদের একালের একজন শক্তিধর শিষ্যরূপে জান্‌বেন, এবং তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব ক'রে তাঁর মুক্তি-মন্ত্রে নিজেদের হারিয়ে-ফেলা মুক্তি ও মনুষ্যত্ব-বোধের অমৃতস্বাদ পুনরায় লাভ কর্‌বেন।

হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের চিন্তাধারার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে, উভয়ের শাস্ত্রকে আস্বাদ ক'রে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যার জটিলতম অংশের সমাধান রামমোহন নিজের জীবনে ও সৃষ্টিতে করেছেন। আজ হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই চিত্তে শুভবুদ্ধি শোচনীয়ভাবে আচ্ছন্ন। এই আত্মঘাতী মোহের অবসানে, আধুনিক ভারতের সত্যকার নেতা রামমোহনের উপর উভয়ের দৃষ্টি পড়্‌লে, হয়ত সুফল ফল্‌বে।

আর শুধু হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান কেন, প্রাচীন শাস্ত্রকে একেবারে বাদ না দিয়ে কিন্তু সেই শাস্ত্রের উপর বিচার-বুদ্ধি ও লোক-শ্রেয়ের আদর্শের প্রাধান্য দিয়ে নব্যভারতের এগিয়ে চলার জন্য যে পথ-নির্দ্দেশ তিনি করেছেন, মনে হয়, ভারতের জন্য আজো সেই-ই শ্রেষ্ঠতম পথনির্দ্দেশ। রামমোহনের পরে অন্যান্য সাধকের আবির্ভাব ভারতভূমিতে ঘটেছে; তাঁদের প্রচারের ফলে গুরু ও শাস্ত্রের নব প্রয়োজনীয়তা মানুষ

উপলব্ধি করেছে, মানুষের জ্ঞানের পরিধিও কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বিশেষভাবে ভেবে দেখ্‌বার কথা এই, ভারতের কোন্ সমস্যা বড়,—'হৃদয়ারণ্যের গহনে' ঘুরপাক খাওয়ার সমস্যা, না, 'বৃহৎ জগতের' সঙ্গে কি ভাবে যোগযুক্ত হওয়া যায় সেই সমস্যা। মনে হয়, 'বৃহৎ জগতের' সঙ্গে কি ভাবে যোগযুক্ত হওয়া যায় সে-বিষয়ে ভারত বহুকাল ধ'রে অনেক পরিমাণে উদাসীন রয়েছে ব'লে 'সোঽহং' 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' 'নরনারায়ণের পূজা' ইত্যাদি মহাসত্ত্ব বাণীর সঙ্গে কোন্ অতীত কাল থেকে তার বুকের উপর দিয়ে হাতধরাধরি ক'রে চ'লে আস্‌ছে হীনতম অস্পৃশ্যতা, উৎকট বর্ণবিভাগ সমস্যা!—এই সঙ্কটে হয়ত রামমোহনের 'শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা লোকশ্রেয়ঃ আর বিচারবুদ্ধি'র আদর্শেরই এই ক্ষমতা আছে যাতে ভারতের জড়তাগ্রস্ত সাধারণ জীবনে বীর্য্য সঞ্চারিত হ'তে পারে।

প্রশ্ন হ'তে পারে, লোকশ্রেয়ঃ আর বিচারবুদ্ধিকে যখন শাস্ত্রের উপর প্রাধান্য দেওয়া হ'ল, তখন শাস্ত্রের কথা একেবারে না তোলাই হয়ত সমীচীন ছিল। এর সাধারণ উত্তর—লোক-স্থিতির জন্য প্রাচীন শাস্ত্রের প্রয়োজন আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের আর একটি কথা মনে হয়। শাস্ত্র যাঁদের চিত্ত থেকে উৎসারিত হয়েছিল, তাঁরাও গভীরভাবে সত্য- ও শ্রেয়ঃ-অন্বেষী ছিলেন, সত্যের অপরূপ পুলক-বেদনা নিজেদের চিত্ত দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই চিররহস্যমণ্ডিত সত্যের অন্বেষণ যখন কারো ভিতরে প্রবল হ'য়ে জাগে তখন কোনো কোনো শাস্ত্র তাঁর পক্ষে অমূল্য অবলম্বনেরই কার্য্য করতে পারে। রামমোহনের অতি গভীর প্রকৃতি মানুষের এ প্রয়োজনকে উপেক্ষার চক্ষে দেখ্‌তে পারে নাই। কিন্তু কারো কারো পক্ষে কোনো বিশেষ অবস্থায় শাস্ত্রের এবম্বিধ প্রয়োজন অনুভূত হ'লেও সর্ব্বসাধারণের স্বাভাবিক অবস্থায় 'লোকশ্রেয়ঃ আর

বিচার বুদ্ধি'র আদর্শ ই যে মানুষের পক্ষে অশেষ কল্যাণের নিদান অতি পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতেই তিনি সে-সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বাস্তবিক যত গভীর ক'রে আমরা ভাব্‌তে যাব ততই সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার্‌ব, রামমোহনের এই যে আদর্শ—প্রাচীন শাস্ত্রে শ্রদ্ধা কিন্তু তারও উপর লোকশ্রেয়ঃ ও বিচারবুদ্ধির প্রাধান্য—মানুষের সমাজকে সবল ও সুন্দর রাখ্‌বার জন্য এ কত অমোঘ।

এই সম্পর্কে আর একটি কথা আমাদের মনে পড়্‌ছে;—পরে পরে উদ্ভাবিত উপশাস্ত্রগুলির প্রতি কতকটা উপেক্ষা প্রদর্শন ক'রে রামমোহন মানুষকে চোখ দিতে বলেছেন সব ধর্ম্মের মূল শাস্ত্রের উপর। পৌরাণিক যুগকে উপেক্ষা ক'রে হিন্দুকে তিনি অবলম্বন কর্‌তে বলেছেন বেদ ও উপনিষৎ; "ফকীহ্"দের ইস্‌লাম-ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান ক'রে মুসলমানকে অবলম্বন কর্‌তে বলেছেন মূল কোরআন; আর পরে পরে উদ্ভাবিত ত্রিত্ববাদ প্রভৃতি উপেক্ষা ক'রে খৃষ্টানকে গ্রহণ কর্‌তে বলেছেন মূল বাইবেল। অথচ তিনি নিজে প্রাচীন বৈদিক ঋষির মতো জটাবল্কলও পরিধান করেন নাই, ফলমূল খেয়ে জীবন অতিবাহিত করবার প্রয়োজনও তেমন অনুভব করেন নাই, আর শিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষকে বিশেষ ক'রে অনুশীলন কর্‌তে বলেছেন—আধুনিকতম বিজ্ঞান!—তাঁর এই মনোভাবের অর্থ মিল্‌বে তাঁর এই উক্তির ভিতরে, "ধর্ম্ম যদি ঈশ্বরের, রাজনীতি তবে কি শয়তানের?"—অথবা, সে অর্থ আরো ভাল ক'রে মিল্‌বে গুরু কামালের এই বাণীতে:—"বিশ্বজগৎ চলেছে ভগবানের উৎসব-যাত্রায়, নিত্যই চলেছে তাঁর 'বরিয়াত' (বরযাত্রা)। প্রতি মানব নিজ নিজ মশাল জ্বালিয়ে চলেছে। গ্রহ চন্দ্র তারার মশালশ্রেণী চলেছে অসীম আকাশে, মানবসাধনার দীপাবলী চলেছে কালের আকাশে। সাধক

মাঝে মাঝে ভুলে যায়, ধ্যান নির্জ্জীব হ'য়ে আসে, নিত্যকালের উৎসব-পথে মুহ্যমান মশাল নিয়ে মানব ঘুমিয়ে পড়ে। এমন সময়ে মহাপুরুষ আসেন বজ্রগম্ভীর উদ্‌বোধন মন্ত্রে তাদের জাগিয়ে দিতে। সাধন যখন যেখানে প্রাণহীন স্থগিত হ'য়ে আসে অগ্নিময়ী দীক্ষা নিয়ে সেখানেই মানবের মহাগুরুরা আসেন। তাঁরা চ'লে গেলে বিষয়ী কৃপণ সাম্প্রদায়িক সত্যের ভাণ্ডারীরা সেই মশালগুলিও চায় সঞ্চয় ক'রে রেখে বৈষয়িকতা চালাতে। জ্বলন্ত মশাল ভাণ্ডারে জমান অসম্ভব, তাই তারা নির্জ্জীব আগুনটুকুও নিবিয়ে দিয়ে সংগ্রহ করে কেবল মশালের মৃত দণ্ড ও দগ্ধাবশেষ ন্যাকড়া।"*...সমস্ত রকমের সত্য-অনুসন্ধান, সমস্ত শুভ চেষ্টা, যে আমাদের জীবনে ভগবানের উৎসব (রাজনীতিও যে ঈশ্বরের), সমর্পিত-প্রাণ মহাকর্ম্মী রামমোহন তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই যেখানে মানুষ অন্তহীন প্রয়াসে নিজেদের জীবনে ভগবানের উৎসব-আয়োজন করেছে—যেমন প্রত্যেক ধর্ম্মের মূল শাস্ত্রগুলির ভিতরে, অথবা আধুনিক বিজ্ঞানে—সেখানে তিনি সশ্রদ্ধ নেত্রপাত করেছেন। কিন্তু যেখানে সেই উৎসব রচনার চাইতে হীন অনুকরণের আয়োজন, উঞ্ছবৃত্তির আয়োজন, বেশী হয়েছে, মানুষের অনন্ত-শুভ-চেষ্টার-নিয়ামক চিরজাগ্রত ভগবানের সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়ায় মুক্তির যে অপরিসীম আনন্দ তা ক্ষুণ্ণ হয়েছে,—যেমন পরে পরে উদ্‌ভাবিত উপশাস্ত্রগুলির ভিতরে,—সেখান থেকে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন। রামমোহনের এই যে চিরজাগ্রত ভগবানকে মানুষের অন্তহীন শুভ-প্রয়াসের ভিতর দিয়ে উপলব্ধি কর্‌বার সাধনা, সৌভাগ্যক্রমে, আমাদের সাহিত্যে তা রূপ লাভ করে চলেছে। তাই আশা হয়, হয়ত বাঙালী তার গৌরব-সামগ্রী রামমোহনের মাহাত্ম্য

---

* শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের অপ্রকাশিত সংগ্রহ থেকে গৃহীত।

একদিন পূর্ণভাবেই হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার্‌বে, এবং তাতে ক'রে ইতিহাসে তার জন্য এক বড় জাতির আসন রচিত হবে।

জ্ঞানই মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়, রামমোহনের এই মত সম্বন্ধে দুই একটি কথা ব'লে আমার এই সামান্য আলোচনার উপসংহার কর্‌ব। মুক্তি অর্থাৎ ভগবৎ-উপলব্ধি কি সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা হয়ত কেউই কাউকে ব'লে দিতে পারেন না। যিনি সে-মুক্তি পান তিনি নিজেই তা অনুভব করেন; কিন্তু কেমন ক'রে তাঁর সেই অনুভূতির অধিকারী অন্যেও হ'তে পারে, সে-সম্বন্ধে যে-সব উপদেশ আদেশ তিনি অপরকে দেন তা তার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়; পর্য্যাপ্ত হ'লে মানুষের জন্য ধর্ম্ম কি, পথ কি, তার মীমাংসা জগতে সহজ হ'য়ে আস্‌ত। তার উপর, মুক্তি-প্রাপ্ত ব'লে মানুষের নিকট যাঁরা পরিচিত সেই সকল অবতার পয়গম্বর ঋষি সাধক কবি প্রভৃতির যে সমস্ত জীবনকাহিনী ও বাণী আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি তা মনোযোগ দিয়ে প'ড়ে দেখ্‌লে মনে হয়, হয়ত এঁদের সকলের কাছে মুক্তির একই রূপ, একই আস্বাদ, ছিল না। কিন্তু এ বিচারের চাইতে এই সম্পর্কে অন্য একটি কথা আমাদের কাছে বেশী মূল্যবান্; সেটি এই যে, এই মুক্তি-প্রাপ্তদের ভিতরে যাঁরা জ্ঞানের উপর বেশী জোর দিয়েছেন তাঁরাই মানুষের বেশী নির্ভরযোগ্য প্রতিপন্ন হয়েছেন—ভাবোন্মত্ত প্রেমিক-দের চাইতে তাঁদের নেতৃত্বে মানুষের আত্ম-প্রকাশের অবসর বেশী ঘটেছে। তাই, জ্ঞানই মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায় কিনা সে বিচারের ভার মুক্তির অধিকারী-দের উপর ন্যস্ত রেখে এ কথা আমরা সহজভাবেই হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পারি যে, জ্ঞান-সাধনার ভিতরে মানুষের জন্য অনন্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

এর উপর আধুনিক ভারতবাসীদের জন্যে তাদের নেতার এই কথার অন্য অর্থও আছে। ভারতে শান্তি ও মৈত্রীর সমস্যা আর জগতে শান্তি ও

মৈত্রীর সমস্যা প্রায় তুল্যরূপে কৃচ্ছ্রসাধ্য। এ অবস্থায় জ্ঞানের অনির্ব্বাণ সাধনাকে উপেক্ষা ক'রে কোনো সম্প্রদায়-বিশেষের বা শাস্ত্র-বিশেষের বিশ্বাস-রুচিকে প্রাধান্য দিলে সত্যকার কল্যাণের পথ থেকে দূরে স'রে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। বাস্তবিক, জ্ঞানের সাধনাকে দৃঢ়মুষ্টিতে অবলম্বন করা ভিন্ন ভারতের যে প্রকৃত কল্যাণ নাই, যে কোনো চক্ষুষ্মাণ ব্যক্তি তা স্বীকার করবেন।

ভারত এক নব সমন্বয়ই কামনা করছে। নব মানবতার উদ্‌বোধন, মানব-জীবনের নব সম্ভাব্যতায় বিশ্বাস, ভারতের সত্যকার মঙ্গলের জন্য চাই। রামমোহনের মুক্তিমন্ত্রে, বিরাট জ্ঞান-সমন্বয়ে, সেই নব সমন্বয়ের অক্ষয় ভিত্তি পত্তন হয়েছে,—আজ তাঁর স্মৃতিবাসরে এই কথাটি সসম্মানে স্মরণ করছি।

মিলনের কথা

নবাবগঞ্জ আশ্রমের পুরাণো মুখপত্র 'হাতে-খড়ি'র কয়েক সংখ্যা পড়তে পড়তে হৃদয়ে যথেষ্ট আনন্দের উদ্রেক হ'চ্ছিল। হিন্দু ও মুসলমান দেশ-সেবার শুভ সংকল্প নিয়ে এখানে মিলেছেন; আর বেশ জাগ্রত সে শুভ সংকল্প তাঁদের মনে;—আজকালকার এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে এমন আনন্দ-সংবাদ দেশের কত কম জায়গা থেকে শুনবার সৌভাগ্য আমাদের হয়।

"হাতে-খড়ি"র পুরাণো সংখ্যাগুলিতে দেখছিলাম, এর লেখকরা যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে দেশ-সেবার কথা আলোচনা করেছেন। তাঁদের লেখার ভঙ্গী দেখে মনে হ'চ্ছিল তাঁরা নবীন, অর্থাৎ, জয়-পরাজয়রূপ অত্যন্ত বাজে কথাটার সঙ্গে তাঁদের খুব বেশী মোকাবেলা হয় নাই। এতেই ইচ্ছা হ'য়েছে তাঁদের সুরে সুর মিলিয়ে দেশ-সেবা সম্বন্ধে দুই একটী কথা ব'লতে। আমার এ কথাগুলো তাঁদের এই সেবার আগ্রহে শ্রদ্ধা ও আনন্দের উপহার।

হিন্দু মুসলমানের মিলন হোক একথা যথেষ্ট পুরাতন। কিন্তু পুরাতন হ'লেও অনুর্ব্বর ক্ষেত্রের গাছপালার মতো এ খর্ব্বাকৃতি হ'য়ে আছে। আমাদের জীবনের কোনো সত্যকার কাজেই এ লাগে নাই বলা যেতে পারে। এরই মধ্যে দেশ ও মানব-প্রেমিক 'মহাত্মা' এর মূলে কিছু জল সিঞ্চন ক'রেছিলেন। তাই এর চেহারাটা কিছু উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল; আমাদের মনে আশা হ'য়েছিল—হয় ত এ শ্যাম সমারোহে বেড়ে উঠবে, এর ফলে ও ছায়ায় আমরা তৃপ্ত হব।

কিন্তু তা হ'লো না। 'মহাত্মা'র প্রেম-সিঞ্চনেও এই বহু কালের খর্ব্বাকৃতি হিন্দুমুসলমান-মিলনতরু কেন ফলে ফুলে সুশোভিত হ'য়ে উঠল না, সে কথা ভাবতে গিয়ে মনে হয়, যে ক্ষেত্রে এর পরিবর্দ্ধনের আয়োজন করা হ'য়েছে সেই ক্ষেত্রই হয় ত এই পরিবর্দ্ধনের পরিপন্থী। অথবা সে ক্ষেত্রে যা জন্মে এমন খর্ব্বাকৃতি হ'য়ে থাকাই তার স্বভাব।

হিন্দু মুসলমান মিলন-সমস্যাটা বাস্তবিকই আমাদের সম্পূর্ণ নূতন ক'রে ভাবতে হবে। আমাদের নানা ধরণের বিফলতা হয় ত তারই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রছে।

'হিন্দু" ও 'মুসলমান'—এর মিলন—এই কথাটাই হয়ত একটা প্রকাণ্ড অসত্য; কেননা 'হিন্দু' ও 'মুসলমান' মানুষের এই দুই স্বতন্ত্র সংজ্ঞা হয়ত তাদের রচিত শাস্ত্র পর্য্যন্ত সত্য, কিন্তু বিধাতার রচিত তাদের যে জীবন সেখানে তা সত্য নয়। দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা বুঝাতে চেষ্টা ক'রব। গ্রামে রহিম শেখ ও শ্রীহরি মণ্ডল বাস করে। দুই জনেই জমি চষে, পাট ও ধানের মৌসুমে দুই জনেই কিছু ঘটা ক'রে খাওয়া-দাওয়া করে, আর ভাণ্ডারের পুঁজি ফুরিয়ে এলে দুই জনেই মহাজনের ছেঁড়া চাটাইয়ের উপর ধর্ন্না দিয়ে বলে, কর্ত্তা মশাই, আপনি মুখ তুলে না তাকালে কেমন ক'রে বাঁচি। কিছু প্রাচীন সংস্কার ও আহারাদির কিছু পার্থক্যের জন্য এদের দেহ ও মনের চেহারায় কিছু পার্থক্য আছে। কিন্তু সে পার্থক্য ত মানুষে মানুষে আছেই। এদের যদি হিন্দু ও মুসলমান শুধু এই দুই দলেই ভাগ ক'রে দেখা হয় এবং এই দুই দলের লোক হিসাবেই এদের ভিতরে মিলনের আয়োজন করা হয়, এরা দুই জনই যে অজ্ঞ অসহায় মানুষ সুতরাং সেই দিক দিয়ে নিকটতর আত্মীয় এ সত্য যদি

ভুলেও মনে স্থান দেওয়া না হয়, তবে এই অসত্যকে অবলম্বন করার অপরাধে আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশী।—অথবা ধরুন দুইজন ভদ্র হিন্দু ও মুসলমানের কথা। শ্রীনাথ রায় ও সৈয়দ আলফাজ-উদ্দীন এক গ্রামের মানুষ। শ্রীনাথ রায়ের কিছু ব্রহ্মোত্তর ও অন্য জমাজমি আছে। সৈয়দ আলফাজ-উদ্দীনের কিছু লাখেরাজ ও অন্য জমাজমি আছে। বনিয়াদি ভদ্রলোক ব'লে গ্রামে দুই জনেরই বেশ সম্মান প্রতিপত্তি। তাই বনিয়াদি সংস্কারগুলোর উপরে তাঁদের দৃষ্টিও একটু বেশী। রায় মহাশয় সাধ্যের অতিরিক্ত হ'লেও দোল দুর্গোৎসব কিছু ঘটা ক'রেই ক'রতে চান, আর রমজানের দিনে লোক খাওয়ানো, অন্ততঃ পরিবারের বয়স্কদের পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ, এ সবের দিকে সৈয়দ সাহেবের দৃষ্টিও কিছু বেশী। দুই জনের ভিতরে এই যে মানুষের স্বাভাবিক আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা এ সমস্তকে সেই দৃষ্টিতে না দেখে, হিন্দু ও মুসলমান এই দুই দলের লোকের স্বাভাবিক ধর্ম্মকর্ম্ম হিসাবে দেখলে, সত্যকে দেখা হয় না।

ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, সত্যই মানুষেব একমাত্র অবলম্বন। অত্যন্ত চেষ্টা ক'রেও সত্যপথ-রেখা থেকে দূরে চ'লে যাবার শক্তি হয়ত মানুষের নাই। হিন্দুমুসলমান-মিলনসমস্যায় এই সত্যের সন্ধানই আমাদের প্রাণপণে ক'রতে হবে। হিন্দু ও মুসলমান মানুষকে এই দুই দলে ভাগ ক'রে দেখা অসত্য—এ সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণভাবেই জাগ্রত হ'তে হবে। তা হ'লে সহজেই আমরা বুঝতে পারবো, হিন্দু-মুসলমানের এই বিরোধের মূল শুধু এই দুই সম্প্রদায়ের শাস্ত্রের ভিতরেই প্রোথিত নয়। আমাদের এই অভিশপ্ত দেশের মানুষ বহুকাল ধরে দুঃস্বপ্নে কাটিয়েছে,—এমন দুঃস্বপ্ন দেখা মানুষের ইতিহাসে খুব নতুন নয় —নিজেদের শুধু হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ভাগে ভাগ ক'রে দেখা সেই

দুঃস্বপ্নেরই জের টেনে চলা!—সেই দুঃস্বপ্ন চুকিয়ে দিয়ে আমাদের দৃষ্টিমান্ ও বীর্য্যবন্ত হ'তে হবে।—মানুষকে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি ভাগে ভাগ ক'রে দেখা ভুল, এ দৃষ্টি হয় ত আমাদের অনেকেরই ভিতরে এসেছে; কিন্তু আমাদের জীবনে বীর্য্য নাই যার অভাবে এই-দৃষ্টি-দিয়ে-দেখা সত্য আমাদের জীবনে দৃঢ় রূপ গ্রহণ ক'রতে পারছে না।

হে আমার তরুণ বন্ধুগণ, আপনাদের এই উৎসবের দিনে শুধু এই কথাটিই আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমরা শুধু হিন্দু ও মুসলমান নই—আমরা মানুষ। সেই মানুষের অনন্ত দুঃখ, অনন্ত সুখ, অনন্ত রূপ। সে আজ আমাদের সামনে অস্পৃশ্যঅন্ত্যজরূপে এসেছে, মহাপ্রেমিকরূপে এসেছে, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান রূপে এসেছে। কিন্তু শুধু এই-ই তার চরম অভিব্যক্তি নয়, মানুষেব ইতিহাসের ধারা এইখানে এসেই থেমে যায় নাই। মানুষের নব নব দুঃখ, নব নব সুখ, নব নব রূপ, কালের পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হ'চ্ছে। সে-সমস্তের দিকে যদি আমরা না তাকাই, শুধু হিন্দু ও মুসলমান মানুষের এই কোনো একটা যুগের রূপকে তার চরম রূপ ব'লে মনে করি, তবে শুধু এই পরিচয়ই দেওয়া হবে যে, আমরা অন্ধ। আর অন্ধ চিরদিনই হাৎড়ে' হাৎড়ে' ধাক্কা খেয়ে খেয়ে চলে, অল্প সময়ের জন্যও বুক ফুলিয়ে রাজপথ দিয়ে চ'লবার অধিকার তার নাই।

নবাবগঞ্জ আশ্রমের বার্ষিক অধিবেশনের জন্য লিখিত। মাঘ, ১৩৩৩

এই নীলবিদ্রোহের মুসলমান চাষীর কথার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার শিক্ষা বিস্তারে মহসীনের দানের কথা, * ঢাকা নগরীর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ঢাকার নবাবদের দানের কথা, মনে হ'য়েছিল, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'য়েছিল, এঁরা ত মুসলমান সমাজে নিঃসঙ্গ নন। কি কারণে নিশ্চয় করে বলা শক্ত, ধনবান্ মুসলমানেরা ধনকে কোনোদিন বহুমূল্য মনে করতে পারেন নাই, তাই দানের ধারা অনায়াসে তাঁদের চার পাশে ছড়িয়ে পড়তে বাধা পায় নাই; আর তাতে করে' মানুষের অঙ্গনে নিত্যই নবনব আনন্দ-কুসুম ফুটেছে। একালের চাঁদমিয়া, ফাজেল মোহম্মদ, মোহম্মদ হোসেন প্রভৃতিরও দানের কথা যখন ভাবতে যাই তখন বুঝতে পারি, অর্থব্যয়ে চিরঅকাতরচিত্ত মুসলমানের এঁরা অযোগ্য উত্তরাধিকারী নন।—এই যে মানুষের দল, মুখের ভাষা যাদের ভিতরে অকর্ম্মণ্য, কিন্তু যাদের জীবনের ভিতরে উপলব্ধি করা যায় যেন আদিম কুর্ম্মের নীরব বীর্য্য, অথবা আদিম প্রকৃতির প্রাচুর্য্য, এদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনবগত থাকা অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু দেশের জীবনোৎসবে এদের সেবার স্পর্শ লাগে নাই, অথবা ভবিষ্যতে এদের এই প্রাণ-অবদান জাতির আঙিনায় "রঙীন হ'য়ে গোলাপ হয়ে উঠবে না", একথা অবিশ্বাস্য বলে ভাবতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়।

(২)

সাহিত্য জীবনবৃক্ষের ফুল, জাতি বা সমাজ বিশেষের মগ্নচৈতন্যের রসের যোগানে তার বিকাশ ঘটে। সেই গূঢ় রস বাংলার মুসলমান সমাজের অন্তরে সঞ্চিত আছে কি না তাদের সাহিত্য-সমস্যার আলোচনা সম্পর্কে তার সন্ধান নিশ্চয়ই অপ্রয়োজনীয় নয়।—কিন্তু শক্ত প্রশ্ন এই

* তাঁর দানে প্রথম ৩০ বৎসর হিন্দু মুসলমান সমভাবে উপকৃত হয়েছেন।

হবে, সাহিত্যে সেই রসের যোগ্য স্ফূর্ত্তি আমরা কবে দেখ্‌ব ? এর উত্তরে যদি বলা যায়, তা কি করে' বল্‌ব, তাহলে অনেকে শুধু বিরক্তই হবেন না, ক্ষুণ্ণও হবেন। কিন্তু এ ভিন্ন এ প্রশ্নের আর কিইবা উত্তর আছে? সাহিত্যের বিকাশকে কতকটা তুলনা করা যেতে পারে ফুল-ফোটার সঙ্গে। ফুল গাছের মূলে আমরা পরম যত্নে জল ঢাল্‌তে পারি, দেশ বিদেশ থেকে তার জন্য ভাল সারও আন্‌তে পারি, তবু ফুল ফুট্‌বে কি না অথবা ভাল ফুল ফুট্‌বে কি না সে সম্বন্ধে যেমন হুকুম করতে পারি না, সাহিত্য সম্বন্ধেও তেমনি সমাজের ভিতরে স্কুল-কলেজ-লেবরেটারির স্থাপনা, বিচার-বিতর্কের সৌকর্য্যসাধন, ইত্যাদির পরও পরম আগ্রহে কালের পানে চেয়ে থাকা ভিন্ন আর আমাদের কি করবার আছে?

সাহিত্য-সমস্যা বাস্তবিকই কোনো সমাজের সত্যকার সমস্যা নয়। সাহিত্যের বিকাশ যখন কোনো সমাজের ভিতরে মন্দগতি অথবা হতশ্রী হ'য়ে আসে তখন বুঝ্‌তে হবে, হয়ত তার এক মৌসুম শেষ হ'য়ে গেছে তারপর কিছুদিন কতকটা নিষ্ফল ভাবেই কাটবে।—অথবা, তার জীবনা-য়োজনে বড় রকমের ত্রুটী উপস্থিত হয়েছে।—এই শেষের অবস্থা কোনো সমাজের পক্ষে মারাত্মক।

বাংলার মুসলমানসমাজে এপর্য্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের উদ্গম হয় নাই, শুধু এই ব্যাপারটীই তার আত্মসম্মানের পক্ষে হয়ত মারাত্মক নয়। কিন্তু সে-সমাজের লোক যে এপর্য্যন্ত জাতীয় জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই তেমন গৌরবের আসন লাভ করতে পারে নাই, বরং তাদের মর্য্যাদা সম্বন্ধে জানতে হ'লে অনুসন্ধান করে' জান্‌তে হয়, এতেই তার অবস্থা সম্বন্ধে আশঙ্কা আপনা থেকে এসে পড়ে। আর, তার অবস্থা

ভাল করে’ চেয়ে দেখ্‌তে গেলে চোখে পড়ে, সত্যই বাংলার মুসলমানের জীবনায়োজন মারাত্মক ত্রুটীতে পরিপূর্ণ, যাতে করে’ মনুষ্যত্বের পর্য্যাপ্ত বিকাশই সেখানে সম্ভবপর হচ্ছে না,—সাহিত্য-সৃষ্টির কথা আর সেখানে ভাবা যায় কি করে’।

এই সম্পর্কে নানা গুরুতর কথার সম্মুখীন আমাদের হতে হয়। বলা যেতে পারে, সে-সমস্তের কেন্দ্রগত কথা এই :—ইসলাম কি ভাবে মানুষের জন্য কল্যাণপ্রসূ হবে সেই কথাটাই হয়ত আগাগোড়া আমাদের নূতন করে’ ভাবতে হবে।—আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা ইসলামের যে রূপ দিতে প্রয়াস পেয়েছেন তা যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন ; অন্ততঃ তাকে আমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে যে ভাবে লাভ করেছি তার সম্বন্ধে অস্পষ্টতার অপবাদ দেওয়া সম্ভবপর নয়। স্পষ্টভাবেই আমাদের সামনে গ্রহণীয়রূপে-বিধৃত ইসলাম নারীর অবরোধ সমর্থন করেছে, সুদের আদান-প্রদানের উপর অভিসম্পাত জানিয়েছে, ললিত কলার চর্চ্চায় আপত্তি তুলেছে, আর চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের দৃঢ়কণ্ঠে বলে’ দিয়েছে, তোমাদের সমস্ত চিন্তা সব সময়ে যেন সীমাবদ্ধ থাকে কোরআন ও হাদিসের চিন্তার দ্বারা। এই সমস্ত কথাই আমাদের নূতন করে’ ভেবে দেখতে হবে,—ভেবে দেখ্‌তে হবে, মুসলমান-সমাজের মানুষদের কর্ম্ম ও চিন্তার স্বাধীনতায় এইভাবে যে অনেকখানি নূতন রকমের প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত করা হ’য়েছে এতে করে’ কি সত্যকার কল্যাণ লাভ হ’য়েছে।—এই সমস্ত ব্যবস্থার পিছনে যে সাধু উদ্দেশ্য আছে একথা বুঝ্‌তে পারা কষ্টসাধ্য নয়। সংযম ও পবিত্রতা, পরিশ্রম ও করুণপ্রাণতা, এবং সুন্দর ও মহনীয়ের প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধা—এ সমস্তের কথা যাঁরা মানুষকে বল্‌তে চেয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু আমাদের নূতন করে’ ভেবে দেখবার প্রয়োজন এই

জন্য যে, সংযম ও পবিত্রতাকে নারীর অবরোধের দ্বারা, পরিশ্রম ও করুণপ্রাণতাকে সুদের আদান প্রদান নিষেধের দ্বারা,ও সুন্দর ও মহনীয়ের প্রতি শ্রদ্ধাকে মানুষের বুদ্ধি শৃঙ্খলিত করার দ্বারা, সম্ভবপর করে' তুল্‌তে প্রয়াস পেলে অসম্ভব কিছুর প্রতি হাত বাড়ানো হয় কি না, অন্যকথায়, তাতে করে' মানবপ্রকৃতির উপর অত্যাচার করা হয় কি না, যার জন্য সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।

যতটুকু বুঝবার ক্ষমতা আমাদের হয়েছে তাতে মনে হয়, ইসলামের যে-রূপ দিতে প্রয়াস পাওয়া হ'য়েছে, অথবা মানুষকে ইসলামের সার সত্য গ্রহণের উপযোগী করবার জন্য যে-পথে চালিত করতে চেষ্টা করা হয়েছে, তাতে করে' মানুষের উপর সত্যই অত্যাচার করা হয়েছে। যে ব্যবস্থায় বড় সত্যের পানে মানুষের চিত্তের আকর্ষণ অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসে ইসলামের সমাজ-ব্যবস্থায় তার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নাই; সে ব্যবস্থায় যতখানি বিজ্ঞান-দৃষ্টি আছে তার চাইতে অনেকখানি বেশী আছে ব্যস্ততা ও অসহিষ্ণুতা। দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা বোঝাতে চেষ্টা করব। ইসলামের শ্রেষ্ঠ সত্য তৌহীদ মানবচিত্তের চির মুক্তির বাণী। বার বার মানুষ তার কীর্তির শৃঙ্খলে আদর্শের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে; "Every idea is a prison, every heaven is a prison"; আর সেই বন্ধনের সামনে বারবার দাঁড়িয়ে বলবার যোগ্য এই বাণী 'নাই, আল্লাহ্‌ ভিন্ন আর কেউ উপাস্য নাই'; আর সাম্য এই মুক্তি ও অগ্রগতির চিরসহচর। মানুষের এই অগ্রগতিতে সংযমের প্রয়োজন নিশ্চয়ই কিছুমাত্র কম নয়,— যেমন নদীর জন্য কূলের বাঁধের প্রয়োজন কিছুমাত্র কম নয়। কিন্তু কূলের বাঁধের পত্তন ক'রে ত নদীর সৃষ্টি হয় না, নদীর প্রবাহ আপন প্রয়োজনে কূলের বাঁধের সৃষ্টি করে' চলে। মানুষের অগ্রগতির জন্যও

প্রয়োজনীয় যে সংযম তারও তেমনিভাবে ভিতর থেকে জন্ম হওয়া চাই। বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া সংযমের সত্যকার মূল্য মানুষের জীবনে কত সামান্য! তাই মানুষের যে বন্ধু চান, ইসলামের এই বড় সত্যের পানে মানুষের চিত্ত উন্মুখ হোক, তাঁর কাজ কি এই হওয়া উচিত নয় যে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধনের সহায়তা তিনি করবেন? কেননা সর্ব্বাঙ্গীন পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধন যার হয় নাই এই দূরের পথের যাত্রী হবার সামর্থ্য তার কোথায়? তার পরিবর্ত্তে বাইরে থেকে বিধি-নিষেধ ও অবরোধ চাপিয়ে চাপিয়ে যে সব মানুষকে সংযত করবার চেষ্টা করা হয়েছে তাদের চিত্তের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিরই ত কিছুমাত্র অবকাশ দেওয়া হয় নাই। তারা যে বড়জোর অর্দ্ধ-বিকশিত মানুষ! তারা কি করে' হবে মুক্তিপথ-যাত্রী!

তার পর ললিত কলার চর্চ্চাকে যে মুসলমানসমাজ থেকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে, কোন্ মস্তিষ্কবান্ ব্যক্তি একে সমর্থন করতে পারেন? নিশ্চয়ই নেতাদের এই হুকুমে মুসলমান তার এত দীর্ঘ জীবন সৌন্দর্য্য- ও আনন্দ-বিহীন হয়েই কাটায় নাই, কিন্তু আমাদের ভেবে দেখবার দিন এসেছে যে, সাধারণ মুসলমান সমাজের সম্মতিক্রমে আনন্দ ও সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা করতে পারে নাই বলে' তার সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তিতে কতখানি বাধা পড়েছে।

এখানে হয়ত কথা উঠবে, ইসলামে অনেকখানি Puritanism আছে এবং তারজন্য আমাদের লজ্জিত হবার দরকার করে না। আমি নিজেও ইসলামের এই রসবাহুল্যবর্জ্জিত ধাতের জন্য লজ্জিত নই। শুধু এই কথাটুকু বলতে চাই যে, Puritanism এক বৃহৎ মানব-

সমাজের শ্রেণী-বিশেষের বরণীয় হ'তে পারে, তাতে করে' সেই সমাজের স্বাস্থ্যের ও সৌন্দর্য্যের কিছু আনুকূল্যই ঘটে (সম্বৎসরের ঋতুর সমাহারে গ্রীষ্মের যেমন এক অনুপম সার্থকতা), কিন্তু Puritanismকে এক বৃহৎ মানব-সমাজের সমস্তের বরণীয় করে' তুলতে প্রয়াস পেলে Puritanism ত ব্যর্থ হয়ই সঙ্গে সঙ্গে সেই সমাজেরও দুর্ভাগ্যের অবধি থাকে না।

এর একটী দৃষ্টান্ত প্রায় সমসাময়িক কালের বাংলাদেশে আমরা পাই। বাংলা সাহিত্যে বাংলার উচ্চশ্রেণীর মুসলমানের বিশেষ লক্ষ্যযোগ্য কোনো দান নাই, অর্থাৎ এমন দান যার জন্য বাংলার চিত্তে শ্রদ্ধা জেগেছে, তা আপনারা জানেন। কিন্তু বাংলার লোকসঙ্গীতে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের দান সাদরে গৃহীত হয়েছে—যেমন পাগলাকানাইয়ের গান, লালন ফকিরের গান, ইত্যাদি। এইসব গানের ভিতরে বুঝতে পারা যায়, ইস্‌লামের একেশ্বর-তত্ত্ব গান-রচয়িতাদের মনে স্থান পেয়েছিল। আর তারই সঙ্গে তাদের চারপাশের বাউল সাধনা, বৈষ্ণব সাধনা, ইত্যাদি মিশেছিল,—সব মিলে কেমন এক অসীমের সংবাদে তাদের চিত্ত তৃপ্ত ও মধুর হ'য়েছিল। মাতৃভাষায় রচিত এই সব গান এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছে, আর চাষীদের অভাবগ্রস্ত জীবনে আনন্দ ও তৃপ্তি দিয়েছে—তাদের অনন্তের ক্ষুধা অনেক পরিমাণে মিটিয়েছে। কিন্তু মানুষের অন্তরের বেদনার প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন আমাদের আলেম-সম্প্রদায় শাস্ত্রের ভয় দেখিয়ে শিক্ষা ও সাধনাহীন সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা আদায় করে' পল্লীর মুসলমান চাষীর এই গানের ফোয়ারা বন্ধ করে' দিয়েছেন। পরিপূর্ণ ইসলাম (কোরআনের ব্যবস্থার সমগ্রতা) মানুষের জন্য যে কল্যাণ ও শান্তি বহন করে এঁদের সাধ্য নাই সেই সম্পদ এই চাষীদের দ্বারদেশে এঁরা পৌঁছে দেন ; শুধু মাঝখান থেকে হালাল হারাম সম্বন্ধে দুই একটা

হুকুম শুনিয়ে, ও Puritanismএর গোঁয়ার্ত্তুমিতে এদের জীবন নিরানন্দ করে' দিয়ে, তাঁরা কর্ত্তব্য শেষ করেছেন।—এই চাষীদের জীবনকে কিছু সুন্দর ও উন্নত করবার জন্য এই সব গানের কতখানি সামর্থ্য ছিল আমাদের পুনরায় সেকথা ভাবতে হবে না কি?

এই সম্পর্কে একটী ভাববার মতো কথা আমাদের সামনে এসে পড়েছে। সেটী এই যে, কি নিজের সমাজের সামনে, কি অন্য সমাজের সামনে, নিষ্ঠাবান্ মুসলমানের চেষ্টা হোক তাঁর উপলব্ধ ইসলামের স্বরূপ মানুষের সামনে ফুটিয়ে তোলা। সেই চেষ্টায় তাঁর কিছুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ না পাক। কিন্তু ঠিক তেমনিভাবে অপরের ইসলাম বা ইসলামের অংশ বিশেষের গ্রহণ-ব্যাপারেও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকুক। "ধর্ম্মে বল-প্রয়োগ নিষেধ" কোরআনের এই মহতী বাণী মুসলমানের জন্য সত্য হোক।

এ কথাটী বলবার একটী বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। অন্য সমাজের লোকদের উপর ধর্ম্মের ব্যাপারে কিছুতেই আমরা জবরদস্তি করতে পারি না একথা আমাদের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই মনে স্থান দেন। কিন্তু মুসলমানসমাজের ভিতরকার লোকদের জন্যও যে এ ব্যবস্থা প্রযোজ্য সে কথা ভাবতে আমাদের অনেকেই হয়ত রাজি নন। এ সম্বন্ধে বাংলার শিক্ষিত মুসলমানসমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে এক সময়ে আমার কথা হয়েছিল। ধর্ম্মবিষয়ে ব্যক্তির স্বাধীনতা মানতে হবে, আমার এই কথার উত্তরে তিনি প্রশ্ন করলেন, তাহলে মুসলমান কাকে বলব? আমি বলেছিলাম—যাদের সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ যারা এ সমাজে জন্মেছে অথবা এতে আশ্রয় নিয়েছে। নইলে চোর ভণ্ড

স্বেচ্ছাচারী প্রভৃতি যারা প্রতিনিয়ত তাদের আচরণ দ্বারা কোরআন ও হজরত মোহম্মদের উপদেশ-আদেশ অস্বীকার করছে তারা মুসলমান বলে' নিজদের পরিচয় দিতে পারত না, সমাজও তাদের মুসলমান বলে' স্বীকার করতে পারত না।—তাঁর সঙ্গে এই তর্ক হচ্ছিল, আমাদের উভয়ের জনৈক বন্ধুর কোনো তথাকথিত অনৈসলামিক কথার আলোচনা সম্পর্কে। কিন্তু তিনি আমার মত মানতে কিছুতেই রাজি হতে পারছিলেন না। শেষে একটা কথা বলে' তাঁকে ভাবিয়ে তুলতে চাইলাম—বললাম দেখুন আজ উনি যা বলছেন হয়ত দুদিন প'রে নিজেই ওখান থেকে ফিরে আসবেন ; একটা Struggling soul-এর বেদনা আমাদের সমাজ বুঝবে না ?—কিন্তু তিনি অম্লান বদনে বল্লেন, তা যখন তাঁর Struggle শেষ হয়ে যাবে তখন যেন তিনি মুসলমান সমাজে ফিরে' আসেন।

মুসলমান সমাজের কর্ম্মকর্ত্তারা যে কি আশ্চর্য্যভাবে পাষাণ প্রতিমার সেবক পাণ্ডাদের মতো পাষাণচিত্ত হয়ে পড়েছেন, মানুষের মনের কত কামনা কত বেদনা কত ভাঙাগড়া এ সম্বন্ধে তাঁরা যে কত চেতনাহীন হ'য়ে পড়েছেন, সে-সব কথা আজ না ভাবলে আমাদের দুর্দ্দশার পরিমাণ উপলব্ধি করা যাবে না। মানুষের জীবন সুন্দর হোক, কল্যাণময় হোক, সেখানে যেন আমি আমার সশ্রদ্ধ সেবা পৌঁছে দিতে পারি, এভাব যেন তাঁদের মনের ত্রিসীমায়ও ঘেঁষেনা। তার পরিবর্ত্তে মানুষের মাথায় কতকগুলো বিধি-নিষেধ ছুঁড়ে মেরেই আল্লাহ্‌র সৈনিক হওয়ার গৌরব তাঁরা উপলব্ধি করতে চান !

মুসলমানসমাজে যে সমস্ত নরনারী বাস করে তারা শুধু মুসলমান নয়, তারা মানুষ—দেশবিদেশের নানা ধর্ম্মের নানা বর্ণের মানুষের

আত্মীয়। সেই বিশ্ববৃহৎ মানবসমাজের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষার চেষ্টা-বিফলতার মধ্য দিয়ে উৎসারিত হচ্ছে এই বাণী যে,—মানুষ দুঃসাহসী, তার অনন্ত ক্ষুধা, জড় জগতের বন্ধনই সে মানতে রাজি নয়, চিন্তার জগতের ত কথাই নাই।—মানুষের এই বাণীর সার্থকতার কোনো আয়োজন কি মুসলমানসমাজে করতে হবে না? যা সুন্দর শুধু তাই দিয়ে দৃষ্টি আবৃত করে' কি মুসলমান তার সৌন্দর্য্য বুঝতে পারবে? না, একথাও সে বুঝবে যে এর জন্য সত্যকার প্রয়োজন হচ্ছে সেই সুন্দর বস্তুকে কিছু দূরে স্থাপন করা, যাতে করে' সমস্ত জগত তার চোখে প্রতিভাত হবে, তারই সঙ্গে মিলিয়ে সেই বস্তুর সৌন্দর্য্য সে উপলব্ধি করবে?—চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির মুক্তি, এতে শুধু মানুষের অধিকার থাকা উচিত নয়, এই হচ্ছে তার জীবন-পথে বিধাতার দেওয়া পাথেয়। যেমন করেই হোক এই পাথেয়ের ব্যবহার মানুষ করে, তবে অনেক সময়ে ভয়ে ভয়ে করে বলে' তার অন্তপ্রকৃতির যথোপযুক্ত পুষ্টিলাভ হয় না।

কিছু ভিন্ন দৃষ্টিভূমি থেকে দেখে বলা যেতে পারে, সাহিত্য জ্ঞানের সুরভি, তাই জ্ঞানচর্চ্চা সমাজে অব্যাহত থাকলে সাহিত্যের জন্য আর কোনো ভাবনা থাকে না। কিন্তু সেই জ্ঞানচর্চ্চার জন্য প্রয়োজনীয় মুক্ত বুদ্ধির, অথবা তারও চাইতে বেশী প্রয়োজনীয় সমাজজীবনে বৈচিত্র্যের—মুক্ত বুদ্ধি যার সন্ততি। অবরোধ ও নিরক্ষরতার চাপে আমাদের সমাজের অর্দ্ধেক শক্তি ব্যক্তিত্বহীন ও অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছে; সেই অর্দ্ধেকের সংস্পর্শে এসে অপরার্দ্ধেরও চিত্তবিকাশের অবকাশ কোথায়? মানুষের চিত্ত যার আঘাতে জেগে উঠ্‌বে সেই বৈচিত্র্য এমনি করেই আমাদের সমাজে দুর্লভ হয়ে পড়েছে।

সুন্দর ও সবল জীবনের জন্য যত কিছুর প্রয়োজন তার এত অভাব বাংলার মুসলমান কি করে' পূরণ করবে, এ কথা ভাবতে গেলে সত্যই অবসন্ন হয়ে পড়তে হয়। কিন্তু আশার অবকাশও যে নাই তা নয়। বাংলার মুসলমানসমাজের অন্তরে সেই গূঢ় জীবনরস যদি সত্যই সঞ্চিত থাকে তবে তার এই সঙ্কট-সময়ে তার কোলে তার বীরপুত্রদের জন্ম হবে, যারা তার সমস্ত অভাব সমস্ত বন্ধন ঘুচিয়ে দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের যোগ্য সূতিকাগাররূপে, তৌহীদের যোগ্য বাহনরূপে। ইসলামের যে তৌহীদ মুক্ত নির্বারিত জ্ঞান ও পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের শিখরই তার যোগ্য অধিষ্ঠানভূমি। মুসলমান অকারণে ভীত হয়ে সেই অমূল্য মাণিককে অন্ধবিশ্বাসের গুহায় লুকিয়ে রেখে তার সার্থকতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

(৩)

সাহিত্যের বিকাশের জন্য সত্যকার প্রয়োজন হচ্ছে সুব্যবস্থিত সমাজ-জীবনের, জীবনের বহুভঙ্গিমতার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধার। সেই দিক দিয়ে যে সব ত্রুটী বাংলার মুসলমানসমাজে রয়েছে তার মারাত্মকতা কত বেশী তাই একটু বিস্তৃত ভাবে বলতে প্রয়াস পেয়েছি। তবু হয়ত পরিষ্কার করে' বলা হয় নাই। আপনারা নিজেদের চেষ্টায় সেই অসম্পূর্ণতা পুষিয়ে নেবেন। *

কিন্তু কেউ কেউ বলতে পারেন, কালের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানের

* এ সম্বন্ধে আর একটী কথা মনে পড়ছে। ইসলামের ইতিহাসের অমৃতফল বলে' মুসলমান যা সব নিয়ে গর্ব্ব করেন সেই মোতাজেলা দর্শন, সুফী সাহিত্য, মোগল স্থাপত্য যাঁদের কীর্ত্তি তাঁদের জীবনের দিকে চাইলে বোঝা যায় তাঁরা আধুনিক মুসলমানদের অবলম্বিত ইসলাম-ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই।

পরিদৃষ্টির ও সমাজ-ব্যবস্থার আবশ্যক পরিবর্ত্তন আপনা থেকে হয়ে যাবে ; কাজেই সে-সব কথা না তুলে বর্ত্তমানে সাহিত্য সম্বন্ধে যে সব কথা বাংলার মুসলমানের চিত্তকে আন্দোলিত করছে তার যোগ্য মীমাংসার চেষ্টা করাই সমাচীন—তাতে করেই ধীরে ধীরে আমাদের সব ত্রুটী স্খালিত হয়ে যাবে। এ কথার উত্তরে শুধু এই বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে, কালের ভাণ্ডারে অনন্ত রত্ন রয়েছে, কিন্তু প্রাণপণে না চাইলে তার কাছ থেকে কিছুই আদায় করা যায় না। এই প্রাণপণ চাওয়ারও পিছনে অবশ্য ইতিহাস আছে। কিন্তু এ বিষয়ে কখনো যেন আমাদের ভুল না হয় যে, যারা পেয়েছে তারা সমস্ত দেহমন দিয়ে চেয়েছে।—তা ছাড়া সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সব সমস্যা আজকাল বাংলার মুসলমানের চিত্তকে আন্দোলিত করছে বলে' বোধ হচ্ছে সে সব বাস্তবিকই তাঁদের সামনে প্রবল চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে নাই। উর্দ্দূ-বাংলা সমস্যা যে সত্যই তাঁদের জন্য কোনো সমস্যা নয় তার প্রমাণ ত বাংলার মুসলমান সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরা তাঁদের সামান্য ক্ষমতার ভিতর দিয়েও প্রতিনিয়তই দিচ্ছেন। আর বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহারের অনুপাত-সমস্যাও সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানের খুব অল্প দিনের ~~শিক্ষা~~নবিশীর পরিচায়ক ; আরো কিছুদিন গেলেই ও সম্বন্ধে তাঁদের খেয়াল আপনা থেকে দুরস্ত হয়ে যাবে এমন আশা করা যায়, কেননা সাহিত্যের জন্য প্রয়োজন শুধু শব্দের নয়, বর্ণ ও গন্ধযুক্ত শব্দের, অন্য কথায়, শব্দের গায়ে বর্ণ ও গন্ধ মাখিয়ে দিতে পারে এমন চিত্তের, এতটুকুও বুঝবার ক্ষমতা বাঙালী মুসলমানের হবেনা এ ধারণা নিয়ে তাঁদের সাহিত্য-সমস্যার আলোচনা করা নিশ্চয়ই বিড়ম্বনা। তবে এই সব সমস্যার সম্পর্কে একটী কথা ভাববার আছে ;—এই সব সমস্যার ভিতর দিয়ে বাংলার আধুনিক মুসলমানের একটী বিশেষ কামনা ফুটে বেরুতে চাচ্ছে, সেটী এই—"বাংলার মুসলমানকে সত্যকার মুসলমান হতে হবে"।

মুসলমানের এই মনোভাবের বিশ্লেষণ করলে প্রধানতঃ দুটী চিন্তা-ধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তার একটীকে বলা যেতে পারে প্রতিক্রিয়া, অন্যটী ক্ষোভ অথবা অনুশোচনা। বাংলা সাহিত্য আজ জগতের দৃষ্টি একটু-খানি আকর্ষণ করতে পেরেছে এবং তাতে এর সত্যকার অধিকার আছে। কিন্তু তবু সত্যের অনুরোধে সাহিত্যরসিকদের নিশ্চয়ই বলতে হবে, এ সাহিত্য এখনো খুব বেশী পরিমাণে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য—মানুষের দুঃখ ও আনন্দের প্রকাশের চাইতে হিন্দুর বিশেষ দুঃখ ও বিশেষ আনন্দের চর্চ্চাই এতে বেশী। "বাংলার মুসলমানকে মুসলমান হতে হবে" এ হচ্ছে অনেক পরিমাণে মুসলমানের অন্তরে বাংলা সাহিত্যের হিন্দুত্বের প্রতিক্রিয়া। এখানে হয়ত তর্ক হবে—হিন্দুও মানুষ, আর বিশেষকে নিয়েই সাহিত্যের কারবার; কিন্তু তাতে করে' আমার কথাটীর ঠিক উত্তর দেওয়া হবে না। আমি এখানে বাংলা সাহিত্যের দারিদ্র্য সম্বন্ধে এই কথাটুকু বলতে চেয়েছি যে, বাংলা সাহিত্যে হিন্দুর যে চিত্র ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াস পাওয়া হয়েছে বা হচ্ছে তা অনেকখানি অস্বাভাবিক-রকমে হিন্দু, অর্থাৎ, বিশ্বের আঙিনার এক পাশে তার বিশেষ রুচি ও বিশেষ দুঃখ নিয়ে ফুটে' উঠে যে-হিন্দু জগতের সঙ্গে তার অবস্থার মোকাবেলা করতে চাচ্ছে সে-হিন্দু নয়, কিন্তু বিশ্বের মানব-যাত্রীদের পাশ কাটিয়ে তার চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসে' জাতি-ভেদ ও অস্পৃশ্যতার কূটতর্কে সময় কাটাচ্ছে যে হিন্দু সেই হিন্দু।—অবশ্য যারা একবার নীচে পড়ে গেছে তাদের উদ্ধারের ইতিহাস অনেক পরিমাণে যে ঘুরপাক খাওয়া ইতিহাস হবে এ অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আমাদের এই অভিশপ্ত দেশের দুর্ভাগ্যের জের যে আমরা কতকাল টেনে চল্‌ব তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এইখানে যে হিন্দুর হিন্দুত্বের সংঘাতে তার প্রতিবেশী মুসলমানের অন্তরে শুধু সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাই জেগেছে।

ক্ষোভ অথবা অনুশোচনার ভাবটীকে এই প্রতিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে' দেখা যেতে পারে। কিন্তু সেই ক্ষোভ অথবা অনুশোচনার ভিতরে যে আর একটী কথা আছে সেটী না বুঝ্লে আধুনিক বাঙালী মুসলমানের উপর অনেকখানি অবিচার করা হবে। সেটী তার মনের এই একটী বেদনার কথা যে ইসলাম সুন্দর, ইসলাম মহান্, কিন্তু তার যোগ্য প্রকাশ আমরা আমাদের সাহিত্যে দেখ্‌ছিনে কেন?—এই যে বাঙালী মুসলমানের অন্তরে একটুখানি সত্যকার বেদনা জেগেছে এ তার শুভাদৃষ্টের পরিচায়ক—

"আমার ব্যথা যখন আনে আমায়
তোমার দ্বারে।
"তুমি আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাক তারে॥"

কিন্তু এই সম্পর্কে আমাদের সামান্য একটু নিবেদন করবার আছে। সাহিত্যে যে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান নাই ঠিক তা নয়; কিন্তু সাহিত্যিক হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টানের আর সাম্প্রদায়িক হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টানের এক চেহারা নয়। সাম্প্রদায়িক হিন্দু অথবা মুসলমান তার দৈনন্দিন কাজ ও ব্যবহারের ভিতর দিয়ে প্রধানতঃ জগতকে এই বোঝাতে প্রয়াস পায় যে, সে আগে হিন্দু অথবা মুসলমান তার পরে মানুষ। কিন্তু সাহিত্যিক হিন্দু অথবা মুসলমান অন্তরে অন্তরে জানে, সে আগে মানুষ তার পরে হিন্দু অথবা মুসলমান। মানুষের অন্তরের গভীরতম আনন্দ ও বেদনা নিয়েই সাহিত্যের কারবার, সেইখানে সাহিত্যিক মানুষকে তার সম্প্রদায় ও জাতির আবরণ উন্মোচিত করে' দেখেছে, তাই মানুষে মানুষে আত্মীয়তাই সে বেশী করে উপলব্ধি করে। সুতরাং সাহিত্যে জাতি ও ধর্ম্ম-ভেদ যেন কতকটা একই ফুলের দেশ ও কালের ভেদ—ভেদ শুধু পাপড়ির বিন্যাস ও রঙের গাঢ়তার বৈচিত্র্যে।

তাই বাংলার সাম্প্রদায়িক মুসলমান আজ ক্ষোভে দুঃখে অপমানে ও কতকটা সত্যকার বেদনায় ইসলামের যে চিত্র মনে মনে আঁকছেন, বাংলার সাহিত্যিক মুসলমানের হাত দিয়ে তারই প্রতিচ্ছবি নাও বেরুতে পারে, বরং সেই সম্ভাবনাই বেশী। তবে ইসলাম সম্বন্ধে যদি সত্যকার বেদনা তার চিত্তে জেগে থাকে তবে সাহিত্যে তার এক অনুপম রূপ নিশ্চয়ই ফুটে উঠ্‌বে। কিন্তু সাহিত্য যেমন চিরদিন অনুপম তেম্‌নি চিরদিন অভিনব, তাই সাম্প্রদায়িক মুসলমান তার এই কামনার ধনকে প্রথমে নাও চিনে উঠ্‌তে পারে।

সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙালী মুসলমানের মনের গোপনে আরো বহু সমস্যা আছে,—যেমন ইসলামের প্রাচীন ইতিহাসের কোন্ কোন্ পর্য্যায়ের দিকে আমাদের আজ বেশী করে' চাইতে হবে, অথবা আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যের কোন্ কোন্ অংশ আমরা সাদরে গ্রহণ করব, কোন্ কোন্ অংশ বর্জ্জন করে' চলব, ইত্যাদি। কিন্তু এসব বিচারে প্রবৃত্ত হতেও আমরা প্রস্তুত নই, কেননা আগে থাকতে এসব বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আর টাকা পাবার আশায় টাকার থলি তৈরী করা সমান রকমের বিড়ম্বনা। এসব বিচার করবে প্রত্যেক সাহিত্যস্রষ্টা নিজে, আর কি গ্রহণ করবে আর কি বর্জ্জন করবে সেটি নির্ভর করবে তার রুচি ও শক্তির উপর। তবে একটা কাজ করে বাংলার সাম্প্রদায়িক মুসলমান বাংলার সাহিত্যিক মুসলমানদের কিছু সাহায্য করতে পারেন, সেটা হচ্ছে, কোরআন হাদিস ও প্রাচীন মুসলমান গ্রন্থকারদের ভাল বইয়ের বাংলা তর্জ্জমা প্রকাশ করা। অনেক সময়ে দেখা গেছে, অতি সামান্য উপকরণ থেকেও সত্যকার সাহিত্যস্রষ্টাদের হাতে অনেক বড় সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে,—একটা ফুলকি

তাঁদের কল্পনায় আগুন ধরিয়ে দেবার জন্য যেন যথেষ্ট। কিন্তু সেই সামান্য উপকরণটুকুও ত হাতের কাছে চাই।

আর একটা কথা বলে' এই আলোচনা শেষ করব। আমাদের কোনো কোনো সাহিত্যিক আদর্শ ও অনুপ্রেরণার জন্য আমাদের আজকাল চাইতে বল্‌ছেন উর্দ্দু সাহিত্যের দিকে। সে চাওয়াটা মোটেই দূষণীয় নয়, বরং যত বেশী চিত্তের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় ততই আমাদের জন্য মঙ্গলকর। কিন্তু এর ভিতরে যে একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, বাংলা সাহিত্যে বাংলার মুসলমানের অনুপ্রেরণা দেবার মতো কিছু নাই, স্পষ্ট ভাষায়ই বল্‌তে চাই—ওটা দেখার ভুল। উর্দ্দু সাহিত্যের সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নাই; তবে যে সমস্ত উর্দ্দু সাহিত্যিকের নামোল্লেখ করে বাঙালী মুসলমানকে তাঁদের প্রতি ভক্তিমান্ হতে বলা হয় তাঁদের কয়েক জনের লেখার সঙ্গে আমার অল্প-কিছু পরিচয় আছে, এবং সেই পরিচয়ের বলে আমি বরং এর উল্টো কথাই বলতে চাই,—বল্‌তে চাই, বাংলার মুসলমানের অন্তরে প্রেরণা দেবার মতো জিনিস বাংলাদেশে ও বাংলা সাহিত্যেই বেশী আছে।"

বাংলার গত একশত বৎসরের ইতিহাস একটা দেশের পক্ষে গৌরবের ইতিহাস। কিন্তু সেই ইতিহাসের স্রষ্টাদের এ পর্য্যন্ত সাধারণতঃ দেখা হয়েছে হিন্দুর চোখ দিয়ে, অর্থাৎ, সামান্য-সাফল্য-লাভে-গর্ব্বিতচিত্ত আধুনিক হিন্দুর চোখ দিয়ে। সেই আস্ফালন থেকে মুক্ত হয়ে অথবা তাতে বিরক্ত না হয়ে যদি তাকানো যায় এই শত বৎসরের রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, মধুসূদন, রাজনারায়ণ, রামতনু, কেশবচন্দ্র,

ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির দিকে, যদি ভাবা যায়, একটা মুমূর্ষ জাতির দেহে জীবন ফিরিয়ে আনবার জন্য কি প্রাণপণ সাধনা এঁরা করেছেন,—সে সাধনায় কত উদ্বেগ, কত অভিমান, কত নৈরাশ্য, কত উল্লাস,—তখন এই সব শক্তিমানদের কারো কারো জাতি-অভিমান বিজাতি-বিদ্বেষ ইত্যাদির অর্থ আপনা থেকে পরিষ্কার হয়ে আসে; আর সত্য ও কল্যাণের পথে আমাদের অগ্রজরূপে এঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-নিবেদনও আমাদের অন্তরে সহজ হয়ে পড়ে।

তারপর বাংলা সাহিত্যের কথা। এর ভিতরে দোষ যে অনেক আছে সে সম্বন্ধে আগেই কিছু বলা হয়েছে; কিন্তু সমস্ত দোষ ত্রুটী সত্ত্বেও এতে ভাল যেটুকু সম্ভবপর হয়েছে তাকে ডিঙিয়ে যাবার মতো কিছু উর্দ্দূতে পাই নাই; বরং বড় সাহিত্যের যে একটি শ্রেষ্ঠ লক্ষণ মুক্ত-বুদ্ধি তার যতটুকু বিকাশ বাংলাতে হয়েছে ততটুকুও সেখানে চোখে পড়ে নাই। তা ছাড়া চিন্তার জগতেও বাঙালী মুসলমান শুধু টুপি দেখে আত্মীয় ঠাওরাবে এ মনোভাব সম্বন্ধে শুধু এই বলা যায় যে, যত শীগগির এ দূর হয়ে যায় ততই আমাদের লজ্জা কমে।

দেশে দেশে দিকে দিকে মানুষ যে যেখানে সত্য ও কল্যাণের সন্ধানী হয়েছে সে আমার ভাই—একথা যদি মুসলমান প্রাণ খুলে না বল্‌তে পারে তবে বৃথাই তার সাম্য ও একেশ্বর-তত্ত্বের অহঙ্কার।—আর শুধু মুসলমানের সাহিত্য-সৃষ্টি নয়, তার সমস্ত নবসৃষ্টির উৎস এইখানে বাঁধা পড়ে' ক্রন্দন করছে।

"মুসলিম সাহিত্য সমাজে"র প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত। ফাল্গুন, ১৩৩৩

অভিভাষণ

শ্রদ্ধেয় ও স্নেহাস্পদ বন্ধুগণ,

আপনাদের সাদর নিমন্ত্রণের জন্য আপনারা আমার আন্তরিক প্রীতি ও ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনারা আজ আমাকে আপনাদের সভাপতির আসন দান ক'রে সম্মানিত ক'রেছেন। আপনাদের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা-উচ্ছলিত তরুণ চিত্ত—সেই তরুণ চিত্তের চিরনির্ম্মল সম্মান অঞ্জলি পরম শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ ক'রে আমি তাঁরই চরণে নিবেদন ক'রে দিয়েছি যিনি সকল সম্মানের উদ্দেশ্য। আসুন কর্ম্মারম্ভে আমরা এই প্রার্থনা করি যে, আমাদের শক্তি সামান্য, সেই সামান্য শক্তিতে সত্যোদ্‌ঘাটন যদি সম্ভবপর না হয় তবে হে রহমানির-রহীম, সত্যকে আচ্ছন্ন ক'রবার অগৌরব থেকে যেন আমরা রক্ষা পাই।

আমাদের যে দুঃস্থ সমাজ, জানি, তার জন্য আমাদের শিক্ষিত তরুণ-সম্প্রদায়ের চিন্তা-ভাবনার অন্ত নাই। আপনাদের সেই চিন্তা-ভাবনা, অনুরাগ-উৎকণ্ঠা, ব্যথা-উচ্ছ্বাসের অপূর্ব্বতার সঙ্গে পরিচিত হব, অনেকটা সেই জন্যই আজ আপনাদের সঙ্গ লাভ ক'রতে এসেছি। আমার বক্তব্য আজ তাই সামান্য। সেই সামান্য কয়েকটী কথা আপনাদের সমীপে নিবেদন ক'রে আপনাদের স্নেহ ও শ্রদ্ধার ঋণ কিয়ৎ পরিমাণে পরিশোধের চেষ্টা ক'রব।

আপনাদের এখান থেকে নিমন্ত্রণ লাভ ক'রবার কয়েক দিন আগে মনে হচ্ছিল, 'পরিত্রাণ' নাম দিয়ে একটী লেখা লিখ্‌ব। সেটী গল্প হবে, কি প্রবন্ধ হবে, কি রূপক হবে, তা ভেবে ঠিক ক'রতে পারছিলাম না।

শুধু এই একটী কথা বার বার আমাকে পীড়া দিচ্ছিল যে, বাংলার মুসলমানের চিত্ত বড় নিদারুণ ভাবে বদ্ধ—বড় অস্বাভাবিকতাময়, নিষ্করুণ তার জীবন! এর থেকে পরিত্রাণ চাই।—কিসে সে পরিত্রাণ? সে সম্পর্কে একটী ছোটখাটো ছবি চোখে ভাস্‌ছিল;—এক জন শিক্ষিত মুসলমান যুবক সত্যকে খুঁজছে, জীবনকে আস্বাদ ক'রতে চাচ্ছে, তার জন্য সে পরম আগ্রহে শাস্ত্রকে আঁকড়ে ধ'রছে, প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠান-সমূহের গূঢ় অর্থ উপলব্ধির জন্য প্রাণপাত ক'রছে,—শেষে এক দিন কেমন ক'রে তার দৃষ্টি খুলে গেল, শাস্ত্র পদ্ধতি সমস্ত ফেলে দিয়ে সে ব'ল্লে, আমার জন্য সত্য—প্রেম—আমার পারিপার্শ্বিক মানুষের বুকে বুক মিলানো।......

বন্ধুগণ, শুধু এই চিত্রটীই যদি আপনাদের সামনে রেখায় রেখায় পূর্ণ-বিকশিত ক'রে তুলতে পারতাম, তবে আমি খুশী হ'তাম—আপনারাও হয়ত আনন্দিত হ'তেন। কিন্তু তা এখন সম্ভবপর নয়। এই 'পরিত্রাণ' পরিকল্পনাটীতে আমি বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুল্‌তে চাচ্ছিলাম পারিপার্শ্বি-কতার সঙ্গে মানুষের প্রেমবন্ধন। সেই কথাটীই আজ অন্য ভাবে আপনাদের কাছে ব'ল্‌ব। এই পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে প্রেম-বন্ধনেই যে জীবনের সত্যকার প্রকাশ। কিন্তু এই প্রেম-বন্ধন আজ বাংলার মুসলমানের জীবনে নানা ভাবে অস্বীকৃত।

একটী দৃষ্টান্ত দিয়ে আমার বক্তব্য কিছু পরিচ্ছন্ন ক'রতে প্রয়াস পাব। গাছ মাটীতে শিকড় গেড়ে চারিদিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে আকাশের নীচে মাথা তুলে দাঁড়ায়। তার স্তরে স্তরে অসীম বীর্য্য, তার পাতায় পাতায় অফুরন্ত লাবণ্য। কিন্তু গাছের এই অপরিসীম ঐশ্বর্য্যের এক বড় উৎস মাটীতে—যে মাটীর দিকে আমাদের আদৌ দৃষ্টি নাই ব'ল্লে

চলে—যে মাটী অনেক সময়ে হীনদর্শন। তেম্‌নি ভাবে অত্যন্ত ভাগ্যবান্ যে মানুষ তাঁর সেই ভাগ্যের অধিকার রক্ত-সম্পর্কে তিনি হয় ত লাভ ক'রেছেন কোনো পূর্ব্বপুরুষ থেকে—যিনি আজ অখ্যাত, অজ্ঞাত। অখ্যাত থেকে খ্যাততে, অন্ধকার থেকে আলোকে, ধূম থেকে শিখায়, শক্তি নিয়ত পরিস্ফুরিত হ'য়ে চ'লেছে। তাই আলোয়-অন্ধকারে নিবিড় মিলন, অখ্যাত-খ্যাততে পিতা-পুত্র সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ যেখানে বিকৃত জীবন সেখানে তার স্বাভাবিক বিকাশের ধারা হারিয়েছে, হারিয়ে খণ্ডিত বিপর্য্যস্ত কিম্ভূতকিমাকার হ'য়ে পড়েছে। বাংলার মুসলমান-সমাজে এবম্বিধ বহু সঙ্কটের এক বড় দৃষ্টান্ত দেখতে পাবেন আমাদের শিক্ষিতদের ভিতরে যাঁরা বাংলার চাষী-সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত হচ্ছেন তাঁদের জীবনে। যাঁদের তাঁরা সন্তান সেই নিরক্ষর চাষীদের ভিতরে হয়ত এমন অনেক লোক ছিলেন বা আছেন মানুষ হিসাবে 'সম্ভ্রান্ত' সম্প্রদায়ের অনেকে যাঁদের সঙ্গে তুলিত হওয়ারও অযোগ্য। কিন্তু সমাজের বিকৃত বুদ্ধির চাপে তাঁদের এই বর্ত্তমান বংশধরেরা তাঁদের পূর্ব্বপুরুষদের সমগ্র জীবন-ধারার প্রতি পিঠ ফিরিয়ে এক অদ্ভুত মোহে ছুটেছেন 'সম্ভ্রান্ততা'র মরীচিকার পিছনে। সেই 'সম্ভ্রান্ততা'র ছন্দটীও হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের আয়ত্তের বহির্ভূতই থেকে যায়, মাঝখান থেকে চাষীর জীবনের যে মাধুর্য্য—যে অকপটতা ও বীর্য্যবত্তা—যা থেকে উদ্ভূত হ'তে পারতো স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য-সমন্বিত এক নবপর্য্যায় 'শরাফত', তা থেকেও তাঁরা দূরে স'রে পড়েন! এ মোহের হাত থেকে উদ্ধার না পেলে এই মাটীর পৃথিবীর উপর বাংলার মুসলমান দাঁড়াবে কেমন ক'রে? জীবনের এই ক্রমভঙ্গতা, এই মানুষের চিত্তের সমস্ত সুকমার বৃত্তির নিদারুণ নিগ্রহ, এর হাত থেকে অব্যাহতি না পেলে সে যে স্পন্দনহীন পাথর বনে' যাবে!—এ সঙ্কট থেকে উদ্ধারের উপায় কি, তার উত্তর কেবল দিতে পারে যৌবন—আমাদের দেহ-মনের

পূর্ণ-উচ্ছ্বসিত যৌবন, যা উপলব্ধি করে, সে নিজেই পরম সুন্দর—রাজ-বেশ কৃষক-বেশ সবই তার গায়ে মানায় ভাল।

আমার অতীতকে বাদ দিয়ে আমি নই—সে অতীত সুন্দরই হোক আর কুৎসিতই হোক; আমার পরিবেষ্টন আমার ধাত্রী—সে আমার পরম আপনার; এ সমস্ত বুঝের পরিবর্ত্তে মুসলমানের যে ছায়া-শিকার-বৃত্তি আমার একটা লেখায় তাকে বলেছি—সত্য ও সত্যসাধকের মহৈশ্বর্য্যময় প্রকাশের সম্মোহন। এ সম্মোহনের রকমারিত্ব আমাদের জীবনে কত কিছু অবহিতচিত্ত হ'লে আপনারা নিজেরাই তা বুঝতে পারবেন। আজ আপনাদের ব'লতে চাই, এই সম্মোহন মানুষের জন্য যেমন সত্য, মুক্তিও ত তেম্‌নি সত্য,—বাংলার মুসলমানসমাজে সেই মুক্তি আপনারা সত্য ক'রে তুলুন। জ্ঞান-সাধনা এর জন্য আপনাদের এক অতি বড় সহায় সন্দেহ নাই; কিন্তু তার চাইতেও বড় সহায় প্রেম,—নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেওয়ার শক্তি—যার দ্বারা আমরা উপলব্ধি ক'রতে পারি, জীবন অনির্ব্বচনীয়, জগৎ মধুময়। সেই প্রেমে বলীয়ান্ হ'য়ে সমসাময়িক কালের বুকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আপনারা দাঁড়ান, দাঁড়িয়ে বলুন—মানুষের সকল সাধনায় আমার উত্তরাধিকার,—সে উত্তরাধিকার থেকে নিজেকে বঞ্চিত ক'রলে আমি শুধু দরিদ্রই হব না, মানুষের ইতিহাসের ধারা আমার ভিতরে বিপর্য্যস্ত হবে,—সে মানুষের কাছে ও মানুষের স্রষ্টার কাছে আমার ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আরো বলুন হে বাংলার তরুণ মুস্‌লিম, যে, মানবজন্মের সহজ অধিকারে সর্ব্বপ্রথমে আমি মানুষ—দেশ কাল জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে মানুষের আত্মীয়; তারপর, আমি মাটীর সন্তান—মাটীর প্রেম-বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছি আমি আকাশের নীচে মাথা তুলে—আমি বাংলার সন্তান বাঙালী; আর শেষে বলুন, আমি মুস্‌লিম—

আমার মানবত্বের বাঙালীত্বের সমস্ত মাধুর্য্য বর্ণ-বৈচিত্র্যে বিকশিত হ'য়ে এক পরম সার্থকতা লাভ ক'রবে অমরবীর্য্য 'তৌহীদ' ও সাম্যের ছন্দে। —ইস্‌লাম ত হাউই নয় যে তার বাহাদুরী দেখবার জন্যে উদ্‌ভ্রান্তের মতো আমাকে ছুটে যেতে হবে আরব-ময়দানে,—সে সূর্য্য—আমার আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী নিয়েই আমি তার কিরণ-অমৃত লাভ ক'রতে পারব আমার পাতার কুটীরে।—কিন্তু এই সত্যকার সার্থকতার পরিবর্ত্তে দেশ কাল প্রভৃতির সমস্ত দাবীর প্রতি অন্ধ হ'য়ে ভারত বা বাংলার বুদ্ধিমন্ত (?) মুসলমান আজ পর্য্যন্ত প্রাণপণ ক'রছে সর্ব্বাগ্রে মুসলমান হ'তে!—ভিন্ন-পরিবেষ্টনে-বর্দ্ধিত যুগ-যুগান্তের শাস্ত্র ও সংস্কারের ভারবাহী মুসলমান হ'তে!—যার অবশ্যম্ভাবী ফল—ব্যর্থতা আর বিড়ম্বনা।

কিছু দিন আগে এক সভায় হজরতের জীবনী সম্পর্কে আমাকে দুই একটী কথা ব'লতে হ'য়েছিল। আমার বক্তৃতার পর জনৈক শিক্ষিত শ্রোতা আমাকে বলেছিলেন, "আপনার কথা পূরোপূরি বুঝতে পারলাম না। আপনি কি ব'লতে চান?—India Islamised হবে? না, Islam Indianised হবে?" তাঁর সে প্রশ্নের উত্তর দেবার অবসর সে দিন আমার হ'য়েছিল কি না স্মরণ নাই; কিন্তু বহুবার এ প্রশ্নটী আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হ'য়েছে, আর বহুবার নিজের তরফ থেকে এর জওয়াবও দিয়েছি। ভারত ইসলাম-প্রভাবে প্রভাবান্বিত হবে, আর ইস্‌লাম ভারতের জন্যে ভারতের ছাঁচে ঢালাই হবে, এ দুই-ই যে সত্য,—যেমন পিতা পুত্রের ভিতরে রূপান্তরিত হন, ও পুত্র পিতার প্রকৃতি লাভ করে। হবে কি, হ'য়েছে, তার প্রমাণ—নানক কবীর প্রভৃতি মধ্য যুগের অগণিত হিন্দু মুসলমান সাধক, আর একালের রামমোহন ও মুসলমান সমাজের বিভিন্ন মারফতী পন্থীর দল। আর এই ভাঙা-গড়ার শেষ শুধু এইখানেই নয়। আর এই ভাঙা-গড়া যেখানে সত্য হয়েছে সেখানেই ত কল্যাণ সহস্র

ধারে বিচ্ছুরিত হয়ে উঠেছে! জীবন্ত যে সাধনা, জীবন্ত মানুষের প্রকৃতির বৈচিত্র্যের তাড়নায় বিচিত্র হ'য়ে তা প্রকাশ পাবে, এইই ত সত্য। শুধু পাথরের মূর্ত্তিই নির্বিকার হ'য়ে যুগের পর যুগ ধ'রে মানুষের পূজা গ্রহণ করে, আর মানুষও দূর থেকে তাকে নমস্কার জানিয়েই কর্ত্তব্য শেষ করে।

বাংলার বিভিন্ন মারফতী পন্থীর ইঙ্গিত ক'রেছি। এ সম্বন্ধে বহু কথা ভাববার আছে। জ্ঞানের সত্যকার শিক্ষক জ্ঞানী, জ্ঞান যাঁর ভিতরে পরিপাক লাভ ক'রেছে—পুঁথি তার অনেক নীচে; ধর্ম্মেরও তেম্নি সত্যকার শিক্ষক ধার্ম্মিক, ধর্ম্ম যাঁর ভিতরে জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে—ধর্ম্মগ্রন্থ তার অনেক নীচে। জ্ঞান ও ধর্ম্মের এই পরিপাক ও জীবন্ত হওয়ার ব্যাপারে ব্যক্তিত্বের অর্থ কত, সে ব্যক্তিত্ব আবার পরিবেষ্টনের বুকে কি চমৎকার এক উদ্ভব, চিন্তাশীলকে সে সব কথা ব'লবার দরকার করে না। তাই ইস্‌লাম কি ভাবে বাঙালীর জীবনে সার্থকতা লাভ ক'রবে, তার সন্ধান যতটুকু পাওয়া যাবে বাংলার এই মারফতী পন্থীর কাছে ততটুকুও পাওয়া যাবে না বাংলার মওলানার কাছে, কেন না, সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও মারফতী পন্থীর ভিতরে রয়েছে কিছু জীবন্ত ধর্ম্ম, সৃষ্টির বেদনা; পরিবেষ্টনের বুকে সে এক উদ্ভব; আর মওলানা শুধু অনুকারক, অনাস্বাদিত পুঁথির ভাণ্ডারী,—সম্পর্কশূন্য, ছন্দোহীন তাঁর জীবন।

এই মারফতী পন্থীদের বিরুদ্ধে আমাদের আলেম সম্প্রদায় তাঁদের শক্তি প্রয়োগ করেছেন, আপনারা জানেন। এই শক্তি প্রয়োগই নিশ্চয়ই দূষণীয় নয়—সংঘর্ষ চিরদিনই জগতে আছে এবং হয় ত চিরদিনই জগতে থাকবে। তা ছাড়া এক যুগ যে সাধনাকে মূর্ত্ত ক'রে তুল্‌ল,

অন্য যুগের ক্ষুধা তাতে নাও মিট্‌তে পারে। কিন্তু আলেমদের এই শক্তি-প্রয়োগের বিরুদ্ধে কথা ব'লবার সব চাইতে বড় প্রয়োজন এইখানে যে সাধনার দ্বারা সাধনাকে জয় ক'রবার চেষ্টা তাঁরা করেন নাই, তার পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলকে লাঠির জোরে তাঁরা দাবিয়ে দিতে চেয়েছেন। এ-দেশী মারফতী পন্থীদের সাধনার পরিবর্ত্তে যদি একটা বৃহত্তর পূর্ণতর সাধনার সঙ্গে বাংলার চিত্তের যোগসাধনের চেষ্টা আমাদের আলেমদের ভিতরে সত্য হ'তো, তা হ'লে তাঁদের কাছ থেকে শুধু বাউল-ধ্বংস আর নাসারা-দলন ফতোয়াই পেতাম না। ইংরেজের ইতিহাসে দেখতে পাই, এলিজাবেথীয় যুগের শেষভাগে বিকৃত-রুচি রঙ্গমঞ্চ এক সময়ে Puritanগণ বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই বন্ধ করার পিছনে শুধু গায়ের জোরই ছিল না, ছিল একটা নব সাধনার জোর, যার বিকাশ দেখতে পাই মিল্টনের কল্পনায়, ক্রমওয়েলের বীরত্বে, বুনিয়ানের (Bunyan) ধর্ম্ম-সর্ব্বস্বতায়। তাই ইংরেজের ইতিহাসে Puritan-যুগ মানুষের সুকুমার-বৃত্তির নির্য্যাতনের যুগই নয়। সে একটা বিরাট নব-সৃষ্টির যুগ—যার গুণে ইংরেজের জীবন ও সাহিত্য সমৃদ্ধতর হ'য়েছে। কিন্তু আমাদের আলেমদের প্রচেষ্টা থেকে এমন একটা ফল আশা করা কতকটা বালির কাছ থেকে স্নেহ-পদার্থ আশা করার মতো। বাংলার মুসলমান জন-সাধারণের দুঃখ-ব্যথার সঙ্গে যাঁদের সমূহ অপরিচয়, বাংলার ভাব ও কর্ম্মের ইতিহাস যাঁদের স্বপ্নেরও অগোচর, ভিন্ন-পরিবেষ্টনে-জাত পুঁথির সম্মোহন যাঁদের জীবনের একমাত্র মূলধন, তাঁরা বাংলার লোকের জীবনে কিছু সার্থকতার আয়োজন ক'রতে পারবেন সেই দিন যে দিন আকাশের গা থেকে ফুল ঝুল্‌বে, আর গাছ-পালা সব নিরালম্ব শূন্যে শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে সুন্দর ও সতেজ থাকবে!

বন্ধুগণ, শুধু কথার দ্বারা সম্মোহিত হ'য়ে আমাদের বহু কাল কেটেছে। আর কত? এইবার তার অবসান হোক। আপনারা সমস্ত প্রাণ দিয়ে বলুন.—"আমরা আমাদের চার পাশের লোকদের সত্যকার কল্যাণ চাই, শুধু অনাস্বাদিত শাস্ত্রের বাণী উপহার দিয়ে শাস্ত্রকে ও মানুষকে অপমান করতে চাই না।—এই গরজ ও দরদ যদি আপনাদের ভিতরে জাগে তবে অঘটন ঘটবে। এই দরদে আপনাদের নিজেদের প্রকৃতি গভীর হবে— গভীর জ্ঞানের আধার হওয়ার যোগ্য হবে। আপনাদের চার পাশের যে সমস্ত অখ্যাত অজ্ঞাত দীন-দরিদ্র লোক, প্রেমে তাদের সঙ্গে বুক মিলিয়ে তাদের হৃৎস্পন্দন অনুভব ক'রলে দেখবেন—মানুষের কত দুঃখ, কত সমস্যা, কত সুখ! হয় ত তা হ'লে জ্ঞানের দ্বার আপনাদের জন্যে উন্মুক্ত হবে;—হয় ত এমন সমস্ত রত্নের সন্ধান আপনারা পাবেন যা উপহার পেয়ে আমাদের সাহিত্য চিরধন্য হবে।

আজ আপনাদের কাছে আমার এই একটা মাত্রই নিবেদন,— এই পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে প্রেম-বন্ধনের কথা, এই যে যেখানে আছেন সেইখানেই দৃঢ় হ'য়ে দাঁড়াবার কথা। প্রেম-ধর্ম্মের ধর্ম্মী হ'য়ে আপনারা এগিয়ে চলুন।

ফরিদপুর মুসলিম ছাত্র সমিতির বার্ষিক অধিবেশন—১৪ই অগাষ্ট, ১৯২৭।

ডায়রির এক পৃষ্ঠা

(মিলন-সমস্যা)

ফেব্রুয়ারি ১১, ১৯২৬ :—যা আমার হাতের সৃষ্টি নয়, তাতে আমার দরদ নেই, দেশকে আমি যদি নতুন করে' সৃষ্টি করতে পারি তবেই দেশের প্রতি আমার প্রেম জাগ্‌বে। এই একই সৃষ্টির কাজে হিন্দু মুসলমান যদি লাগে তবে সেই ক্ষেত্রে তাদের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের পরিচয় ও প্রেম হবে, দেশব্যাপী মিলন সম্ভবপর হবে।—এই-ই রবীন্দ্রনাথের কালকার জগন্নাথ ইন্‌টারমিডিয়েট কলেজ (ঢাকা) প্রাঙ্গনে প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম।

সত্য কথা। সৃষ্টির কাজে মানুষের যে চিত্তের প্রকাশ ঘটে তা সংকীর্ণ নয়—উন্মুক্ত, উদার, বিপুল। জাতি ও ধর্ম্মের সমস্ত গণ্ডী অতিক্রম করে' মানুষ বুঝতে পারে—আদিম মনুষ্যপ্রকৃতির দিক দিয়ে তারা কত সমধর্ম্মী।—সেই প্রশস্ত ও দৃঢ় ভিত্তির উপর মিলন-সৌধ নির্ম্মিত হতে পারে।

মিলনের আর একটি প্রশস্ততর ও অটলতর ক্ষেত্র আছে—ঈশ্বরানুভূতির ক্ষেত্র। তাঁর নয়নজ্যোতিঃসম্পাতে তাঁর বিপুল সৃষ্টি প্রসন্ন রয়েছে, বর্দ্ধিত হচ্ছে, এ বোধের সঞ্চার হলে মিলনের পরিপন্থী সমস্ত অসূয়া ও ঈর্ষ্যা প্রশমিত হয়ে আসে, ফুলের বর্ণ ও সৌরভের মতো মানুষে মানুষে মিলন স্বাভাবিক হয়ে পড়ে।

কিন্তু এ বড় কথা। এর জন্য প্রয়োজন বড় তপস্যার। তাই রবীন্দ্রনাথের যে ইঙ্গিত, অর্থের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পৃথিবীকে সবাই মিলে

সৃষ্টি করে' সবাই মিলে উপভোগ করে' তারই ভিতর দিয়ে মিলনের দিকে এগিয়ে চলো—এ' পথকে অনেকখানি সুগম করে' দেওয়া। প্রয়োজনের চরিতার্থতা না হলে ত মানুষ বাঁচে না, তাই এই প্রয়োজনের চরিতার্থতার ভিতর দিয়ে তিনি যে সবাইকে মিলনাভিসারী হতে বলেছেন, এ তাঁর মতো দৃষ্টিমানের যোগ্য কথা।

···তবু মনে হয়, তিনি যে মিলনের পথে কাল প্রাণের সদর দরজা পর্য্যন্ত আমাদের পৌঁছে দিয়ে ছুটি নিয়েছিলেন—বলেছিলেন, শুধু চাষ বা ঘর গৃহস্থালীই নয় সাহিত্য কলা সঙ্গীত আমাদের যা-কিছু আছে সমস্ত দেশের জনসাধারণকে দিয়ে তাদের প্রাণকে হিল্লোলিত করে' তুল্‌তে হবে, এই প্রাণ যদি জাগে তবে সব পরিশ্রম চিন্তার ক্ষেত্রে নব নব আবিষ্কার এদের দ্বারাই সম্ভবপর হবে, মিলনও স্থায়ী হবে,—মনে হয়, এ ছুটি না নিলেই হতো ভাল। প্রাণের প্রাচুর্য্যের ভিতরে যে মিলন নিশ্চয়ই সেটি সব চাইতে বড় এবং স্থায়ী মিলন নয়। সেই প্রাণস্রোত যাতে অব্যাহত থাকে সেই জন্য সেই স্রোতের উৎপত্তি হওয়া চাই উচ্চ গিরিকন্দর থেকে —যেখানে আকাশের বৃষ্টিপাত তার ভাণ্ডারকে সব সময়ে পূর্ণ করে' রেখে দেয়। বাস্তবিক একই ঈশ্বরে সবার যে মিলন—কীট পতঙ্গ জড় জীব গ্রহ নক্ষত্র সব-কিছু—মিলনের সেই প্রশস্ততম ক্ষেত্র আবিষ্কার না করা পর্য্যন্ত মানুষ নিজেকে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না, অপরের দিকে প্রেম ও প্রীতির হস্ত প্রসারিত করতে পারবে সে কোন্ শক্তিতে?

এই মিলন উপলব্ধির জন্য বড় তপস্যা চাই। কিন্তু তা থেকে বিমুখ হয়ে লাভ নাই। তা'তে শ্রেয়োলাভ হবে না। অন্ততঃ দেশের

দুই এক জায়গায় এমন গগনচুম্বী হিমাদ্রি চাই—যারা আকাশের নিরন্তর-বর্ষণশীল প্রাচুর্য্যের ভাণ্ডারী হয়ে সমতলে তা সহস্র ধারায় ছড়িয়ে দিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে একথা আমরা শুনেছি। তবে কাল কেন যে তিনি একথা চেপে গেলেন তা বোঝা শক্ত। হয়ত বিশেষ করে' ছাত্রদের সম্বোধন করে' বলছিলেন—তাই দয়াপরবশ হয়ে চেপে গেছেন।—কিন্তু আমাদের এ কথা ভুল্‌লে চল্‌বে না। "সহজের ডাক মানুষের নয়, সহজের ডাক মৌমাছির"—মানুষে মানুষে প্রকৃত মিলন স্থাপনের মতো অতি স্বাভাবিক অথচ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপারে একথা যেন আমরা না ভুলি।

ফাতেহা-ই-দোয়াজদাহাম

উদ্ভিদ সব দিক থেকে নানা আশ্চর্য্য উপাদান আহরণ করে' নিজের জীবনে তা পরিপাক ক'রে জীবের খাদ্যের সংস্থান করে' দেয়। প্রাণের জগতে এ অতি বড় দান। মানুষের ভাব ও কর্ম্মের গহনে তলিয়ে গিয়ে মহাপুরুষও যে-ভাবে মানুষের চলার পথের আবিষ্কার করে' দেন, মনো-জগতের জন্য সেও যে কত বড় দান, তারও উপলব্ধি খুব কষ্টসাধ্য নয়। এক হিসাবে মহাপুরুষের মতো বন্ধু মানুষের আর দ্বিতীয় কেহ নাই। তার অতি আপন হতেও তিনি আপনার জন।

বড় ভাব, বড় খেয়াল, এ সমস্তের অভাব ত সংসারে খুব বেশী নয়। চিরদিনই সংসারে বেশী অভাব ভাবের সত্যকার অনুভাবকের। ভাবকে যিনি নিজের জীবনরসে সঞ্জীবিত ক'রে তোলেন, নিরালম্ব সত্যকে যিনি দৃঢ়তা দান করেন কার্য্যকরী করেন, তাঁর যত প্রশংসাই আমরা করি আসলে তা কত সামান্য! আমাদের সমস্ত প্রশংসার কত ঊর্দ্ধে তাঁর জ্যোতিষ্মান্ আসন!

*   *   *   *

আমাদের মহাগুরুর জীবনের পানে চাইলে এন্‌নিতর তারীফে আর শ্রদ্ধায় আমরা মূক হয়ে যাই। মানুষের বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষার ক্ষমতা-অক্ষমতার কত অতলে তাঁর অনুপ্রবেশ! তারপর, সব সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতো দৈনন্দিন কর্ম্মে আসক্তি ও আস্থা থেকে আরম্ভ করে' দুঃখে দারিদ্র্যে অচঞ্চলতা, অত্যাচারে উৎপীড়নে ধৈর্য্যশীলতা,

মানবপ্রেম, জীবপ্রেম, জাগ্রত আল্লাহ্‌র উপলব্ধি,—তাঁর নিজের জীবন এম্‌নি-ধারা কত সুরে কত কঠিন মূর্চ্ছনায় আমৃত্যু বেজেছে! অন্তরে বাহিরে এম্‌নিভাবে সত্যের গহনে তলিয়ে গিয়ে তিনি মানুষের জন্য উদ্ধার করে' এনেছেন যে তৌহীদ, জীবনের মর্য্যাদা, অনাড়ম্বর সাংসারিক জীবন, তাতে যে সৌষ্ঠব যে লাবণ্য, তার সামনে সাদীর মহাপ্রশস্তিও যে অতিরঞ্জন নয়—

বালাগাল্‌উলা বেকামালিহি।
কাশাফদ্‌দুজা বেজামালিহি।
তাঁর গুণাবলী চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে।
তাঁর সৌন্দর্য্যে সব অন্ধকার দূর হয়েছে।

এসব তত্ত্বহিসাবে তাঁর পূর্ব্বে নিশ্চয়ই মানুষের অপরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু তিনি এ সমস্তের অন্তরে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন যে দৃঢ়তা, প্রাণবেগ, স্বাচ্ছন্দ্য, তারই ফলে এ-সব সম্পদে বিপদে মানুষের ব্যবহারযোগ্য হতে পেরেছে—দৃঢ়মূল মহীরুহ যেমন ঝড়-ঝঞ্ঝার দুর্য্যোগেও প্রাণীর আশ্রয়স্থল হতে পারে।......আর মানুষের জন্য তাঁর এ আবিষ্কার এই তের শত বৎসরের স্বল্প কালে যেভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে তাও কম সুন্দর নয়। এর প্রভাবে মানুষের ইতিহাসের এক অধ্যায় আলোকিত ক'রে বিরাজ করছেন হজরত ওমরের মতো কর্ম্মবীর, ওমরখৈয়াম-সাদীর মতো বিশ্বগ্রন্থের পাঠক, গাজ্জালি-রুমির মতো সাধক, বেলাল-রাবেয়া-মইনুদ্দিনের মতো ভক্ত, হারুণঅররাশীদ-আলমামুন-আকবরের মতো বাদশাহ্‌, আবুহানিফা-খলদুন-আল্‌বেরুনির মতো মনীষী, আর হাফেজ-বাবর-শাহজাহাঁর মতো কবি অথবা জীবন্ত কাব্য। শুধু মুসলমানের গৌরব সামগ্রী এঁরা নন, মানুষের এঁরা আনন্দ-ধন।

*   *   *   *

যাঁর কর্ম্মপ্রেরণায় মানুষের এ রূপ দেখ্‌বার, মানবজীবনের এমন উৎসব প্রত্যক্ষ করবার, সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে তাঁর স্মৃতিবাসরে উৎসব করে' গান গেয়ে মনের আবেগে বল্‌ব—মার্‌হাবা ইয়া সর্‌ওয়ারে কায়েনাত—সুন্দর তুমি, মহান তুমি—এ শুধু স্বাভাবিক নয়, শোভন। কিন্তু সে-উৎসব যে সত্যই আমাদের নেতৃত্বে আর জমে' ওঠে না! সে প্রশংসা-গীতি আমাদের কণ্ঠে যে আর উদাত্ত সুরে বিঘোষিত হয় না!...... জ্ঞানসম্পর্কহীনতায় বহুকাল ধরে' চিত্ত আমাদের মলিন—উৎসবের ঝলক তাতে কি করে' প্রতিফলিত হবে! আত্মবিশ্বাসহীনতায় সমগ্র জীবন আমাদের নির্বীর্য্য—সেই উদাত্ত কণ্ঠ কোথায় মিলবে! এম্‌নিতর বিড়ম্বনায়, এম্‌নিতর বিফলতার বেদনায়ই মানুষের মনে পড়ে—মহাপুরুষের এই দানের ক্ষমতা যেমন সাধারণ নয়, অপরের সেই দান গ্রহণ করবার ক্ষমতাও তেম্‌নি সাধারণ নয়;—শুধু তপস্যার দ্বারাই তপস্যার দান গ্রহণ করা যায়।

*   *   *   *

শুধু তপস্যার দ্বারাই তপস্যার দান গ্রহণ করা যায়,—আমাদের মহাগুরুর স্মৃতি-বাসরে এই কথাটা আজ নূতন করে' আমাদের জপমন্ত্র হোক। অনুশোচনা নয়, অনুকরণের পণ্ডশ্রম নয়, তপস্যা, জীবনকে গভীর করে' উপলব্ধি করবার আকাঙ্ক্ষা—আমাদের জন্য সত্য হোক। তপস্যা আত্মার চিরসঙ্গী। তপস্যার দ্বারা মার্জ্জিত না হলে জীবনে লাবণ্য ফোটে না। সেই তপস্যার বহু কামনা—কখনো জ্ঞান, কখনো সৌন্দর্য্য কখনো এই মরজীবনে অনির্ব্বচনীয়ের স্পর্শ। কিন্তু বড় শিল্পীর রচনা-বৈচিত্র্যে যেমন একত্বের চিহ্ন সুস্পষ্ট, একটা বড় সাধনার ক্রমবিকাশের

ইতিহাসে তেমনি অশেষ বৈচিত্র্যের ভিতরেও একত্ব লক্ষ্যযোগ্য। নব তপস্যার প্রভাবে আমাদের মহাগুরুর সাধনার ধারায় আমাদের একত্ব ও বৈচিত্র্য সত্য হোক, সুন্দর হোক।—শুধু তপস্যাই সৃষ্টি করে; অনুকরণ বড়জোর প্রতীক্ষা।

* * * *

কালের বহু আবর্জ্জনাপূর্ণ স্রোতোধারা সামনে করে' আজ আমরা উপবিষ্ট। আজ জানিনা আমরা, এর কোন্ ধারা অবলম্বন করলে সার্থকতার সাগর-সঙ্গমে পৌঁছা যাবে। আয়োজন আজ আমাদের জীবনে কিছুমাত্র নাই—শুধু মাঝে মাঝে দুই একটা রাজনৈতিক দুঃস্বপ্ন দেখে' আঁৎকে উঠছি মাত্র। একটা সভ্য সমাজের পক্ষে এ অবস্থা অসুন্দর—বীভৎস। অল্পে তৃপ্তি নাই—কল্যাণও নাই; চাই প্রাচুর্য্য। তপস্যা সেই প্রাচুর্য্যের সন্ধান দেবে। যেম্নি করে' আমাদের মহাগুরু দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর সমসাময়িক কালের দুঃখ-ব্যথার মর্ম্মস্থলে, দাঁড়িয়ে সমস্ত জগতের জন্য এক কল্যাণ-পথের আবিষ্কারে প্রয়াসী হয়েছিলেন. তেমনি করে' আমাদেরও দাঁড়াতে হবে আমাদের সমসাময়িক কালের জীবনের সমস্ত দুঃখ-বিপত্তির মাঝখানে—শুধু প্রাচীন পুঁথির জীর্ণ পাতা সাম্নে করে' নয়। গুরুর সত্যকার শিষ্যত্ব এইখানে। গুরু হুকুম নন, অনুশাসন নন, গ্রন্থ নন, গুরু প্রজ্জ্বলিত জীবনানল, আমাদের জন্য যার ইঙ্গিত—তোমরাও এমনি অনল-শিখা হও, এই শিখা হওয়াই মানব-জীবনের জন্য সত্য।

১৩৩২

বাঙলার জাগরণ

আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির ধারণা এই যে বাংলার জাগরণ পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু পূরোপূরি সত্যও যে নয় সে-দিকটা ভেবে দেখবার আছে। যাঁরা এই জাগরণের নেতা তাঁরা কি উদ্দেশ্য-আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, ও এই জাগরণের ফলে দেশের যা লাভ হ'য়েছে তা'র স্বরূপ কি, এই সমস্ত চিন্তা করলে হয়ত আমাদের কথা ভিত্তিশূন্য মনে হ'বে না। রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার থেকে আরম্ভ ক'রে বাজনা ও গোহত্যা নিয়ে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা পর্য্যন্ত আমাদের দেশের চিন্তা ও কর্ম্মধারা, আর ডিইষ্ট এন্‌সাইক্লোপিডিষ্ট থেকে আরম্ভ করে' বোল্‌শেভিজম্ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য চিন্তা ও কর্ম্ম ধারা, এই দুইয়ের উপর চোখ বুলিয়ে গেলেও বুঝতে পারা যায়—আমাদের দেশ তা'র নিজের কর্ম্মফলের বোঝাই বহন ক'রে চলেছে, পাশ্চাত্যের সঙ্গে তা'র পার্থক্য যথেষ্ট লক্ষ্যযোগ্য।—এই পার্থক্য একই সঙ্গে আমাদের জন্য আনন্দের ও বিষাদের। আনন্দের এই জন্য যে এতে করে' আমাদের একটা বিশিষ্ট সত্ত্বার পরিচয় আমরা লাভ করি—অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতির মত আমরা শুধু ইয়োরোপের প্রতিধ্বনি মাত্র নই; আর বিষাদের এই জন্য যে আমাদের জাতীয় চিন্তা ও কর্ম্ম-পরম্পরার ভিতর দিয়ে আমাদের যে ব্যক্তিত্ব সুপ্রকট হয়ে ওঠে সেটি অতীতের অশেষঅভিজ্ঞতা-পুষ্ট অকুতোভয় আধুনিক মানুষের ব্যক্তিত্ব নয়, সেটি অনেকখানি অল্প-পরিসর শাস্ত্রশাসিত মধ্যযুগীয় মানুষের ব্যক্তিত্ব।

এই সঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে রামমোহন থেকে আমাদের দেশে যে নবচিন্তা ও ভাবধারার সূচনা হয়েছে পরে পরের চিন্তা ও কর্ম্মধারা কেবল যে তা'র পরিপোষক হয়েছে তা নয়, এমন কি প্রবল ভাবে তা'র বিরুদ্ধাচারীই হয়েছে বেশী। আর উদ্দেশ্য আদর্শের এই সমস্ত বিরোধ একটা বীর্য্যবান সামঞ্জস্য লাভ ক'রে আমাদের জাতীয় জীবন ও কর্ম্মের যে একটা বিশিষ্ট ধারা সূচিত করবে তা থেকেও আমরা এখনো দূরে।

(২)

বাংলার নবজাগরণের প্রভাত-নক্ষত্র যে রাজা রামমোহন রায় সে সম্বন্ধে কোনো মতভেদ নাই। কিন্তু তাঁকে জাতীয় জাগরণের প্রভাত নক্ষত্র না ব'লে প্রভাত-সূর্য্য বলাই উচিত; কেননা, জাতীয় জীবনে কেবল মাত্র একটি নব চৈতন্যের সাড়াই তাঁর ভিতরে অনুভূত হয় না, সেই দিনে এমন একটি বিরাট নব আদর্শ তিনি জাতির সামনে উপস্থাপিত করে' গেছেন যে এই শত বৎসরেও আমাদের দেশে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন নাই যাঁর আদর্শ রামমোহনের আদর্শের সঙ্গে তুলিত হ'তে পারে। এমন কি, এই শত বৎসরে আমাদের দেশে অন্যান্য যে সমস্ত ভাবুক ও কর্ম্মী জন্মেছেন তাঁদের প্রয়াসকে পাদপীঠরূপে ব্যবহার ক'রে তা'র উপর রামমোহনের আদর্শের নব প্রতিষ্ঠা করলে দেশের জন্য একটা সত্যকার কল্যাণের কাজ হ'বে—এই আমাদের বিশ্বাস।

এই রামমোহন যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ ইত্যাদির দিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নাই। তবু একথা সত্য যে এই পাশ্চাত্য কৃষ্টির সংশ্রবে তিনি এসেছিলেন পূর্ণ

যৌবনে। তা'র আগে আরবী ফারসী ও সংস্কৃত-অভিজ্ঞ রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বাদানুবাদ করেছেন, গৃহত্যাগ ক'রে তিব্বত উত্তর ভারত ভ্রমণ করেছেন, আর সেই অবস্থায় নানক কবীর প্রভৃতি ভক্তদের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন—যাঁরা হিন্দু-চিন্তার উত্তরাধিকার স্বীকার ক'রেও পৌত্তলিকতা অবতারবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। এই সব ভেবে দেখলে ও তাঁর চিত্তের উপর মোতাজেলা সুফি প্রভৃতির প্রভাবের কথা স্মরণ করলে বলতে ইচ্ছা হয়, ভারতে মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের সভ্যতা ও ধর্ম্মের সংঘর্ষ থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন যে নানক কবীর দাদু আক্‌বর আবুলফজল দারাশেকো প্রভৃতি ভক্ত ভাবুক ও কর্ম্মীর দল, অষ্টাবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের রামমোহন তাঁদেরই অন্যতম। অবশ্য মধ্যযুগের সমস্ত খোলস চুকিয়ে দেওয়া একেবারে আধুনিক কালের এক পরম শক্তিমান মানুষের চিত্ত ক্রমেই আমরা তাঁর ভিতরে বেশী করে' অনুভব করতে পারছি। কিন্তু সেটি হয়ত তাঁর উপর আধুনিক কালের ইয়োরোপের প্রভাবের জন্যই নয়, আধুনিক ইয়োরোপ যেমন করে' মধ্যযুগেরই কুক্ষি থেকে উদ্গত হয়েছে রামমোহনের বিকাশও হয়ত সেই ধরণেরই ব্যাপার।

এই একটি লোক রামমোহন হিন্দুর সঙ্গে তর্ক করেছেন বেদ উপনিষৎ রামায়ণ মহাভারত পুরাণ তন্ত্র সংহিতা ও সেই সমস্তের টীকা নিয়ে, মুসলমানের সঙ্গে তর্ক করেছেন কোরআন হাদিস ফেকা মস্তেক ইত্যাদি নিয়ে, আর খৃষ্টানের সঙ্গে তর্কে ব্যবহার করেছেন ইংরেজী গ্রীক ও হিব্রু বাইবেল ও বড় বড় খৃষ্টান পণ্ডিতের মতামত। এই লোকটিই আবার সতীদাহ নিবারণের জন্য লড়েছেন,—মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, চীনের সঙ্গে

অবাধ বাণিজ্য, নারীর দায়াধিকার, বাংলা ব্যাকরণ, ইংরেজের শাসনের সমালোচনা ও সেই ক্ষেত্রে পথনির্দ্দেশ, এই একটী লোকেরই কর্ম্মের প্রেরণা যুগিয়েছে। এই বিরাট পুরুষের জীবন-কথা ও বিভিন্ন রচনা আলোক-পথের পথিক দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের নিত্য-সঙ্গী হ'বার যোগ্য। কিন্তু এই আলোচ্য প্রবন্ধে আমাদের দ্রষ্টব্য—দেশের সামনে কি নির্দ্দেশ তিনি রেখে গেলেন। সেই সম্পর্কে মোটামুটি ভাবে বল্‌তে পারা যায়, ধর্ম্মের ক্ষেত্রে তাঁর নির্দ্দেশ—এক নিরাকার পরমব্রহ্মের উপাসনা, লোকশ্রেয়ঃ ও বিচার-বুদ্ধির দ্বারা পরিশোধিত শাস্ত্র, সেইজন্য পরে পরের উপশাস্ত্রসমূহ প্রত্যাখ্যান ক'রে প্রত্যাবর্ত্তন মূল শাস্ত্রসমূহে; শিক্ষার ক্ষেত্রে,—ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ অনুশীলন; সমাজের ক্ষেত্রে—লোকহিতকর অনুষ্ঠানসমূহের প্রবর্ত্তনা, যা অনিষ্টকর তা প্রাচীন হ'লেও বর্জ্জনীয়; আর রাজনীতির ক্ষেত্রে—Dominion status-এর মতো একটা কিছুর আশা রাখা। এমনিভাবে নানা আন্দোলনে সমগ্র দেশ আন্দোলিত করে' ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন —সেই যাত্রা তাঁর মহাযাত্রা।

(৩)

রামমোহন জাতীয় জীবনে যে সমস্ত কর্ম্মের প্রবর্ত্তনার সঙ্কল্প করেছিলেন তা'র মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু কলেজ অনতিবিলম্বে ফল প্রসব করতে আরম্ভ করে। হিন্দু কলেজের সঙ্গে ডিরোজিওর নাম চিরদিনের জন্য এক সূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে। এই ডিরোজিও যে গুরুর শিষ্য ফরাসী-বিপ্লবের চিন্তার-স্বাধীনতা-বহ্নি তাঁর ভিতরে প্রজ্জ্বলিত ছিল। ডিরোজিওর সেই বহ্নি-দীক্ষা হয়েছিল। অল্প বয়সে যথেষ্ট বিদ্যা অর্জ্জন করে' কবি ও চিন্তাশীল রূপে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। বিশ

বৎসর বয়সে তিনি হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষক রূপে নিয়োজিত হন, আর তিন বৎসর শিক্ষকতা করার পর সেখান থেকে বিতাড়িত হন। এরই ভিতরে তাঁর শিষ্যদের চিত্তে যে আগুন তিনি জ্বালিয়ে দেন তাঁর কলেজ পরিত্যাগের পরও বহুদিন পর্য্যন্ত তা'র তেজ মন্দীভূত হয় নাই। শুধু তাই নয়, নব্যবঙ্গের গুরুদের ভিতরে এই ডিরোজিওর এক বিশিষ্ট স্থান আছে। এঁর শিষ্যেরা অনেকেই চরিত্র বিদ্যা সত্যানুরাগ ইত্যাদির জন্য জাতীয় জীবনে গৌরবের আসন লাভ করেছিলেন, এরই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজের আচার-বিচার বিধি-নিষেধ ইত্যাদির লঙ্ঘন দ্বারা সুনাম বা কুনাম অর্জ্জন ক'রে সমস্ত সমাজের ভিতরে একটা নব মনোভাবের প্রবর্ত্তনা করেন।

ডিরোজিওর দলকে আমাদের কোনো কোনো সাহিত্যিক প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছেন রামমোহনের বিরুদ্ধ দল বলে', কেননা এই দল ধর্ম্ম বিষয়ে উদাসীন ত ছিলেনই অনেক সময় নাস্তিকভাবাপন্ন ছিলেন, আর "If we hate anything from the bottom of our heart it is Hinduism" একথা তাঁদের কেউ কেউ প্রকাশ্য ভাবেই ঘোষণা করতেন। তবু এই ডিরোজিওর দল প্রকৃত প্রস্তাবে হয়ত রামমোহনের বিরুদ্ধ দল নয়। এই ডিরোজিওর দলের অনেকে উত্তরকালে রাম-মোহনের ব্রহ্মসমাজের নেতা ও কর্ম্মী হয়েছিলেন, আর বিদ্যা চরিত্রবল জনহিতৈষণা ইত্যাদি গুণে এঁরা যে ভাবে বিকশিত হ'য়ে উঠেছিলেন তাতে রামমোহনের বিদেহী আত্মার স্নেহাশিষই হয়ত তাঁরা লাভ করেছিলেন।

রামমোহন ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চমৎকারিত্বের ইঙ্গিত দিয়ে-ছিলেন মাত্র, কিন্তু সেই জ্ঞানের স্বাদ বাঙালী প্রকৃত প্রস্তাবে পায়

ডিরোজিওর কাছ থেকে। এই স্বাদের চমৎকারিত্ব কত তা এই থেকে বোঝা যাবে যে বাংলার চির-আদরের মধুসূদন এই ডিরোজিও-প্রভাবের গৌণ ফল। তা ছাড়া সাধারণতঃ বিদ্যানুরাগী বাঙালী হিন্দু এই ডিরোজিওর প্রদর্শিত পথে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেছিলেন তা বাস্তবিকই প্রসংশনীয়। আজো বাঙালী হিন্দুর বিদ্যানুরাগ কমে নাই, কিন্তু ডিরোজিওর শিষ্য-প্রশিষ্যদের সেই আন্তরিকতার লালিমা একটু কেমনতর হ'য়ে গেছে বৈ কি।

কিন্তু এত গুণ ও কার্য্যকারিতা সত্ত্বেও, স্বীকার করতে হ'বে, ডিরোজিওর দল দুই এক পুরুষের বেশী প্রাণ ধারণ করে' থাকতে সমর্থ হন নাই, আর আজ তাঁরা বাস্তবিকই নির্ম্মূল হ'য়ে গেছেন। কেন এমন হয়েছে তা ভাবতে গিয়ে হয়ত বলতে পারা যায়, তাঁরা দেশের ইতিহাসকে একটুও খাতির করতে চান নাই—পবননন্দনের মতো আস্তো ইয়োরোপ-গন্ধমাদন এদেশে বসিয়ে দিতে তাঁরা প্রয়াস পেয়েছিলেন। তবে অন্য একটি কথাও ভাববার আছে। তাঁরা যাই কেন করুন না দীনচিত্ত তাঁরা ছিলেন না—তাঁদের কামনা ভাবনা বাস্তবিকই রূপ নিয়েছিল তাঁদের জীবনে। আর সেই ডিরোজিওর শিষ্য-প্রশিষ্যদের চাইতে আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু যে সর্ব্বাংশে উন্নততর জীব তাও হয়ত সত্য নয়।—তবু সেই ব্যক্তিত্ব ও সুরুচি-সমন্বিত প্রাণবান সারবান অপেক্ষাকৃত সরলচিত্ত ডিরোজিও-দল আমাদের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। অবশ্য চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন কিনা কে জানে।—কে জানে এত জাতি-সম্প্রদায়-বিখণ্ডিত এত শাস্ত্র-উপশাস্ত্র-ভার-ক্লিষ্ট এত পূর্ণাবতার-খণ্ডাবতার নিপীড়িত বাঙালী-জীবন আবার কোনোদিন বল্‌বে কি না—Derozio, Bengal hath need of thee !

রামমোহনের শ্রেষ্ঠ দান কি তা নিয়ে আগেও বাংলা দেশে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, ভবিষ্যতের জন্যও যে সে তর্কবিতর্কের প্রয়োজনীয়তা চুকে' গেছে তা নয়। তবে যে সমস্ত বাদ প্রতিবাদ হয়েছে তা'র মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্তের বাদানুবাদই সুবিখ্যাত। দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বর-প্রেমিক পুরুষ ছিলেন। হাফেজের যে সব লাইন তাঁর অতিপ্রিয় ছিল তা'র একটি এই—হর্‌গিজ মোহ্‌রে তু আজ্‌ লওহে দিল্‌ ও জাঁন বরদ্‌; * তাঁর জীবনের সমস্ত সম্পদ-বিপদের ভিতর দিয়ে তাঁর এই প্রেমের পরিচয় তাঁর দেশবাসীরা পেয়েছেন। প্রথম জীবনেই যে পরীক্ষায় তাঁকে উত্তীর্ণ হ'তে হয়েছিল তা কঠোর—সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সর্ব্বস্ব দানে তিনি পিতৃঋণ হ'তে উদ্ধার পাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। সত্যের যাত্রাপথে "মহান্‌ মৃত্যু"র এমনিভাবে সম্মুখীন হওয়া সমস্ত বাঙালী-জীবনে এক মহা-ঘটনা যাকে বেষ্টন ক'রে বাংলার ভাবস্রোতের নৃত্য চলতে পারে;—হয়ত চলেছে। কিন্তু গুহাপথের যাত্রী হ'য়েও দেবেন্দ্রনাথ গভীরভাবে জ্ঞানানুরাগী ও সৌন্দর্য্যানুরাগী ছিলেন। তবু, সংসারনিষ্ঠা জ্ঞানানুশীলন সৌন্দর্য্যস্পৃহা সমস্তের ভিতরে ঈশ্বর-প্রেমই ছিল তাঁর অন্তরের অন্তরতম বস্তু। তাই তিনি যে রামমোহনকে মুখ্যতঃ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচারকরূপে দেখবেন এ স্বাভাবিক।—কিন্তু অক্ষয়কুমার ছিলেন জ্ঞান-পিপাসু; সে পিপাসা এমন প্রবল যে এত দিনেও বাংলা দেশে সে রকম লোক অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করেছেন। এই অক্ষয়কুমার মত প্রকাশ করেছেন যে রাজার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার। জ্ঞানানুশীলন অক্ষয়-কুমারের কাছে এত বড় জিনিস ছিল যে এ ভিন্ন অন্য রকমের প্রার্থনার

---

* তোমার ছাপ আমার চিত্ত-ফলক থেকে কিছুতেই মুছবে না।

প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করতেন না। তাঁর সেই সুবিখ্যাত সমীকরণ বাংলার চিন্তার ইতিহাসে অক্ষয় হ'য়ে আছে। শুধু প্রার্থনার যে কিছুমাত্র কার্য্যকারিতা নাই তা প্রতিপন্ন করবার জন্য তিনি লিখেছেন—কৃষক পরিশ্রম করে' শস্য উৎপাদন করে প্রার্থনা করে' নয়। একেই তিনি একটী সমীকরণের রূপ দিয়েছেন এইভাবে :—

প্রার্থনা + পরিশ্রম = শস্য
পরিশ্রম = শস্য
∴ প্রার্থনা = ০

অক্ষয়কুমারের এই মনোভাব কিছুদিন ব্রাহ্ম সমাজে ও সেইদিনের ছাত্রমহলে কার্য্যকরী হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর প্রভাব ব্রাহ্ম সমাজে অক্ষুণ্ণ হয় নাই—হয়তো বা দেশের বৃহত্তর জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তেমন ফলপ্রসূ হয় নাই।

শেষ পর্য্যন্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যানই রামমোহনের পরে ব্রাহ্ম সমাজ গ্রহণ করেছিল; আর নানা বিপর্য্যয়ের পর আজো তাঁর নির্দ্দেশই হয়তো অধিকাংশ ব্রাহ্মের মনোজীবনে কার্য্যকরী রয়েছে।

কারো কারো বিশ্বাস দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের যে রূপ দিয়েছিলেন তা রামমোহনের উদ্দেশ্য-আদর্শ থেকে পৃথক বস্তু। কিন্তু তা সত্য নয় এই জন্য যে যে-দ্বৈতবাদের উপর দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের ভিত্তি পত্তন করেছিলেন রামমোহনের জীবনে তা'রই প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। সত্য বটে তিনি বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্য অবলম্বন করেছিলেন; কিন্তু

শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে তাঁর মতভেদ বিস্তর; এমন কি, অধিকাংশ হিন্দু সাধক ও দার্শনিকের অবলম্বিত Pantheistio God-এর চাইতে হিব্রু প্রফেট্‌দের ব্যক্তিত্ব-সমন্বিত, পাপ-পুণ্য ভাল-মন্দের নিয়ামক, ঈশ্বরের দিকেই তাঁর চিত্তের প্রবণতা হয়তো বেশী ছিল। তবে রামমোহনের চিত্তের প্রসার ছিল অনেক বেশী, তাই ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের যে রূপ দিয়েছিলেন, কর্ম্মী জ্ঞানী ও অন্তঃপ্রবাহী-ভক্তিরস-সমন্বিত রামমোহনের বিরাট ইচ্ছাধারা তাতে অবলীলাক্রমে প্রবাহিত হ'তে পারবে তা আশা করা সঙ্গত নয়। কোনো বড় স্রষ্টাই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে পুরোপুরি ধরা পড়েন নাই; রামমোহনের সূচিত ব্রহ্ম-সমাজ যদি তাঁর বিরাট চিত্তের প্রতিচ্ছবি না হ'য়ে থাকে তবে তাতে দুঃখ করবার বিশেষ কিছু নাই।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের যে রূপ দিয়েছিলেন তাতে যে শুধু তাঁর ভক্তি-উচ্ছ্বসিত চিত্তের তরঙ্গাভিঘাতই বুঝতে পারা গেছে তা সত্য নয়। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি নির্ণয়ে তিনি যে মনীষার পরিচয় দিয়েছেন তাতে দেশের চিত্ত-বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর একটা বড় আসন লাভ হয়েছে। প্রথমে বেদকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভিত্তি রূপে গ্রহণ করতে চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল বেদের সব-কিছু আশানুরূপ সুন্দর নয়। তারপর তিনি নির্ভর করতে গেলেন উপনিষদের উপর। সেখানেও মুস্কিল যে উপনিষৎ বহু, বহু রকমের, তা'র উপর শুধু দ্বৈতবাদের প্রতিপাদক বচনই নয় অদ্বৈতবাদের প্রতিপাদক বচনের সংখ্যাও তাতে কম নয়। এই সঙ্কটে জ্ঞানবীর অক্ষয়কুমারের পরামর্শ মতো "আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়" এর উপর ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করা হ'লো। এই ভাবে মানুষের চিত্তকে যে নূতন ক'রে এক গরীয়ান আসন দেওয়া হ'লো,

তার অর্থ কত, ইঙ্গিত কি বিপুল, দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলার জাতীয় জীবনের সামনে থেকে আজ সে সব চিন্তা দূরে স্থিত। তাই জাতীয় জীবনে অক্ষয়-কুমার-দেবেন্দ্রনাথের এই দানের জন্য তাঁদের প্রতি তাঁদের স্বদেশ-বাসীদের অন্তরের শ্রদ্ধা-নিবেদন আজো তেমন পর্য্যাপ্ত নয়।

(৫)

আমরা বলেছি বাংলায় এপর্য্যন্ত যে চিন্তা ও কর্ম্মধারার বিকাশ হয়েছে তাতে মধ্যযুগীয় প্রভাব বেশী। দেবেন্দ্রনাথের কার্য্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তিনি মানুষের চিত্তকে ব্রহ্ম-পাদপীঠ বলে' সম্মান দিয়েছেন, শুধু প্রাচীন ঋষিদের যে কেবল সে অধিকার ছিল তা তিনি মানেন নাই।—কিন্তু এই আবিষ্কৃত সত্যের পূরা ব্যবহারে তিনি যেন কেমন সঙ্কোচ বোধ করেছেন। এই "আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়" কথাটী তিনি পেয়েছেন উপনিষৎ থেকে—নিজের জীবনের ভিতরে এ কথার সায় তিনি নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন। কিন্তু অনন্ত-প্রয়োজনতাড়িত মানুষকে এই অমৃতের সাধনা জীবনের সমস্ত কর্ম্ম সমস্ত অবসর সমস্ত প্রার্থনা সমস্ত অপ্রার্থনার ভিতর দিয়ে করতে হ'বে শুধু বিধিবদ্ধ প্রার্থনার ভিতর দিয়েই নয়—এতটা অগ্রসর হ'তে তিনি যেন পশ্চাৎপদ হয়েছেন। হয়তো বৃহত্তর মনীষা নিয়ে তিনি যদি অক্ষয়কুমারকে আত্মসাৎ করতে পারতেন তা হ'লে ব্রাহ্ম সমাজ তাঁর হাতে যে রূপ লাভ করত তা দেশের পক্ষে আরো কল্যাণদায়ক হ'তো।

দেবেন্দ্রনাথের এই যে অন্তরে অন্তরে সেই ব্রহ্মোল্লাস অনুভব করা; সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ যে তার দৈনন্দিন জীবনে জ্ঞান ও কর্ম্মের ভিতর দিয়ে শ্রেয়ের অন্বেষণ ক'রে যাবে, সে অন্বেষণে মুখের প্রার্থনার প্রয়োজন

সে অনুভব করতে পারে, নাও পারে; অনন্ত কর্ম্ম- ও প্রেম-পুলকিত মানুষের জীবনে তা'র আরাধ্য হয়তো তা'রই জীবনের সুরভি, হয়তো তা'র জ্ঞান নেত্রে বিশ্বজগতের নিয়ামক, হয়তো বিশ্বজগতের জন্য তা'র প্রেমের বন্ধন, হয়তো কর্ম্মক্ষেত্রে তা'র চিরজাগ্রত নেতা—অক্ষয়কুমারের ভিতর দিয়ে উৎসারিত এই আধুনিক মনোভাবকে যে তিনি তেমন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারেন নাই; এইখানেই তাঁর মধ্যযুগীয়ত্ব;—এবং আধুনিক জীবনোপযোগী জ্ঞানানুরাগ সুমার্জ্জিত জীবন-যাপন ইত্যাদি সত্ত্বেও তিনি যে বৃদ্ধবয়সে ভাবের আতিশয্যে নৃত্য করতে পেরেছিলেন হয়তো তাঁর এই প্রগল্‌ভা মধ্য-যুগীয় ভক্তিই তা'র কারণ। অবশ্য মধ্য-যুগীয় ব'লে সে জিনিসটা যে তাচ্ছিল্য বা অসম্ভ্রমের চক্ষে আমরা দেখতে প্রয়াস পাচ্ছি সে কথা মনে করলে আমাদের প্রতি অবিচার করা হ'বে। এখানে শুধু এই কথাটি আমরা বলতে চাচ্ছি যে এত চেষ্টা সত্ত্বেও আধুনিক অগ্রসর জাতিদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলবার সামর্থ্য যে আমাদের হচ্ছে না তা'র এক বড় কারণ—আমাদের যাঁরা নেতৃস্থানীয় তাঁরাও খুব কমই আধুনিক জীবনের দিকে তাকিয়েছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রৌঢ় বয়সে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের নেতা হন। তাঁর উপর খৃষ্টের জীবন ও বাইবেলের প্রভাব বিশেষরূপে কার্য্যকরী হয়েছিল। কেশবচন্দ্রের প্রকৃতির সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতির যে বিশেষ পার্থক্য ছিল অনেকেই সে কথা বলেছেন। কিন্তু এক জায়গায় বড় গভীর মিলও ছিল, সেখানে হয়তো কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথেরই মানস-পুত্র—সেটি, প্রগল্‌ভা ভক্তি। দেবেন্দ্রনাথ রাশভারী লোক ছিলেন, তাই তাঁর অন্তরের এই প্রগল্‌ভা ভক্তি তাঁর বাইরের চেহারা কচিৎ আলুথালু করতে পেরেছে। কিন্তু কেশবচন্দ্র আজন্ম

"অগ্নি মন্ত্রে"র উপাসক। এই প্রগল্‌ভা ভক্তি তাঁকে প্রায় সব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ইত্যাদির দিকে নিয়ে গেছে, নিত্য নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে, আর শেষে জগতের সমস্ত ধর্ম্মের সার সংগ্রহ করে' এক "নব বিধান" বা নব ধর্ম্মের পত্তনে অনুপ্রাণিত করেছে। কেশবচন্দ্র যে শেষ বয়সে পরমহংস রামকৃষ্ণের প্রভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করেছিলেন সেটি কিছুমাত্র আশ্চর্য্য বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। বাংলার চির-পরিচিত প্রগল্‌ভা ভক্তি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার এই এক অদ্ভুত পুরুষ রামকৃষ্ণের জীবনে আশ্চর্য্য পরিণতি লাভ করেছিল। যার প্রেরণায় কেশবচন্দ্র আজীবন নানা পথে ছুটাছুটি করেছেন তা অমন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কারো ভিতরে সঞ্চিত দেখ্‌তে পেলে সেখানে তিনি যে নিজেকে বিকিয়ে দেবেন এ যেমন স্বাভাবিক তেম্‌নি সঙ্গত।

(৬)

সব ধর্ম্মই কি সত্য? এ প্রশ্নের মীমাংসায় রামমোহন বলেছিলেন—বিভিন্ন ধর্ম্মের ভিতরে পরস্পরবিরোধী অনেক নিত্যবিধি বর্ত্তমান, তাই সব ধর্ম্মই সত্য একথা মানা যায় না, তবে সব ধর্ম্মের ভিতরেই সত্য আছে। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের এই মীমাংসা মেনে চলেছিলেন বল্‌তে পারা যায় যদিও উপনিষদের দিকে তিনি বেশী ঝুঁকে পড়েছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের ভক্তিপ্রধান প্রকৃতির কাছে রাজার এ মীমাংসা ব্যর্থ হলো। তিনি বল্‌লেন—Our position is not that there are truths in all religions, but that all established religions of the world are true. এই কথাই রামকৃষ্ণ আরো সোজা করে' বল্‌লেন—যত মত তত পথ।—যত মত তত পথ ত নিশ্চয়ই; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—সে সব পথ একই গন্তব্য স্থানে নিয়ে যায় কিনা। রামকৃষ্ণ

বল্লেন—হাঁ তাই যায়, তিনি সাধনা করে’ দেখেছেন শাক্ত বৈষ্ণব বেদান্ত সুফী খ্রীষ্টান ইত্যাদি সব পথই এক “অখণ্ড সচ্চিদানন্দে”র অনুভূতিতে নিয়ে যায়। এ সব কথার সামনে তর্ক বৃথা। তবে এই একটী কথা বলা যেতে পারে যে মানুষ অনেক সময়ে বেশী ক’রে যা ভাবে চোখেও সে তাই দেখে। *

---

* যত মত তত পথ—এ কথাটির ভিতরে চিন্তার কিছু শিথিলতা আছে। পথ বহু নিশ্চয়ই, কিন্তু যে চল্‌তে চায় তার জন্য একটি বিশেষ পথই পথ, আর জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক সেই পথটি সে নির্ব্বাচন করে’ নেয় বহু পথের ভিতর থেকে।

সব সাধনা এক বিশেষ অনুভূতিতে নিয়ে যায়—এ কথাটির চারপাশেও কিছু স্থূলতা আছে। কাব্য সম্বন্ধে যেমন একটি নির্ব্বিশেষ রসই একমাত্র কথা নয়, তেম্‌নিভাবে সব ধর্ম্মই সত্য বা সব ধর্ম্মেরই লক্ষ্য এক এসব কথার উপর বেশী জোর দিলে মানুষের অনেকখানি চেষ্টার সঙ্গে আমাদের অপরিচয় ঘটে। তাই এসব কথা থেকে জীবনে পর্য্যাপ্ত প্রেরণালাভ সম্ভবপর না হবারই কথা।

রামকৃষ্ণের এই সব উক্তি ভিত্তি করে তাঁকে একালের এক বড় সমন্বয়াচার্য্যরূপে দাঁড় করাবার চেষ্টা আমাদের কোনো কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি করেছেন। তাঁদের সেই চেষ্টার সাফল্যের পথে বিঘ্ন আছে দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। তা ছাড়া সমন্বয় কথাটাও একটু বুঝে দেখা দরকার। সমন্বয় সাধারণতঃ দুই ভাবে দেখা যেতে পারে—মতবাদের সমন্বয় ও জীবনের সমন্বয়। বলা বাহুল্য জীবনের সমন্বয়ই বড় কথা, মানুষের যাঁরা নেতৃস্থানীয় তাঁদের মাহাত্ম্যের পরিমাপ এই থেকে। এই জীবনের বিরাটত্বের দিকে রামকৃষ্ণ যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে চেয়েছিলেন এ কথা বল্লে তাঁর প্রতি বোধ হয় অসত্যের আরোপ করা হবে। বরং তাঁর সম্বন্ধে বোধ হয় এইই সত্য যে তাঁর অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছিল মানুষের জন্য এক সুনিবিড় স্নেহ, তাই মানুষকে তিনি শুনিয়েছিলেন কিছু আশ্বাসের বাণী। তাই তিনিও আমাদের একজন বড় শিক্ষক—বন্ধু। কিন্তু আমাদের কোনো গুরু সম্বন্ধেই অতিরিক্ত বা অসঙ্গত ধারণা থাকা আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য অকল্যাণকর।

রামকৃষ্ণ পরমহংসকে কেউ বলেছেন অবতার, কেউ বলেছেন উন্মাদ। কিন্তু যিনি যাই বলুন বাংলার হিন্দু-চিত্তের উপর তাঁর কথার প্রভাব যে অত্যন্ত বেশী তাতে সন্দেহ নাই। পৌরাণিক ধর্ম্মকে সরিয়ে দিয়ে তা'র স্থানে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হিন্দু জনসাধারণের কাছে প্রতিপন্ন হয়েছে—পৌরাণিক ধর্ম্মের কিছুই বাজে নয়, তা'রই পরতে পরতে রয়েছে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, হয়তো বা তা'র চাইতেও ভাল কিছু।

(৭)

বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মচর্চ্চার উপরে যে একটা মধ্যযুগীয় ছাপ মারা রয়েছে তা আমরা দেখেছি। কিন্তু বাংলার নববিকশিত সাহিত্যে যেন এই ত্রুটীর স্খালনের চেষ্টা প্রথম থেকেই হ'য়ে আসছে। বাংলার নবসাহিত্যের নেতা মধুসূদন আশ্চর্য্য উদার চিত্ত নিয়ে জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন; জাতি ধর্ম্ম ইত্যাদির সঙ্কীর্ণতা যেন জীবনে ক্ষণকালের জন্যও তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নাই; আর এই উদারচিত্ত কবি ইয়োরোপের ও ভারতের প্রাচীন কাব্য-কলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে ভাবে অবলীলাক্রমে আহরণ করে' তাঁর স্বদেশবাসীদের উপহার দিয়েছেন সে কথা বাঙালী চিরদিনই বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।—তাঁর পরে সাহিত্যের যে নেতা বাঙালী জীবনের উপর একটা অক্ষয় ছাপ রেখে গেছেন তিনিও প্রথম-জীবনে শিল্পী সুতরাং সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা অস্পৃষ্ট। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে কবিজনসুলভ স্বপ্ন কম। তিনি বরং নিপুণ চিত্রকর ও বাস্তববাদী স্বদেশ প্রেমিক। তাই তাঁর যে অমর কীর্ত্তি "আনন্দ মঠ" তাতে হয়ত নায়ক নায়িকার গূঢ় আনন্দ-বেদনার রেখাপাত নাই, হয়ত এমন কোনো সৌন্দর্য্য-মূর্ত্তি আঁকা হয় নাই যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে'

মানুষের নয়নে প্রতিভাত হ'বে a thing of beauty আর সেই জন্য a joy for ever ; কিন্তু তবু এটি অমর এই জন্য যে এতে যেন লেখক কি একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতায় পাঠকের সামনে প্রসারিত করে' ধরেছেন দেশের-দুর্দ্দশা-মথিত তাঁর রক্তাক্ত হৃদয়—যে হৃদয় তার সুগভীর বাস্তবতার জন্যই সৌন্দর্য্যের এক রহস্যময় খনি।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্য্যন্ত শিল্পের ক্ষেত্রে থাকতে পারেন নাই ; শেষ বয়সে ধর্ম্মের ক্ষেত্রে তিনি অবতরণ করেছিলেন। তাঁর চরিতাখ্যায়করা বলেন, আত্মীয়বিয়োগে অধীর হ'য়ে তিনি ধর্ম্মে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণ চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে শ্রমস্বীকার করেছেন, যে সুবৃহৎ আদর্শ স্বজাতির সামনে দাঁড় করাতে চেয়েছেন, তাকে আর্ত্তের কর্ম্ম না বলাই সঙ্গত।—বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধর্ম্মালোচনায়ও দেখতে পাওয়া যায় তাঁর দেশ-হিতৈষণা। তবু বঙ্কিমচন্দ্রের চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত দেশের অগ্রগতিকে খানিকটা সাহায্য করলেও বেশী সাহায্য করতে পারে নাই ; কেননা দেশ বলতে কেমন ক'রে তিনি বুঝেছিলেন দেশের হিন্দু—তাও আবার সকল হিন্দু নয় সাময়িক শাসক ও সংস্কারকদের হাতে যে হিন্দু কিছু দিশাহারা হ'য়ে পড়েছিল সেই হিন্দু। এখানেও তাঁর সেই স্বদেশ প্রেম ;—কিন্তু এ প্রেম খুব গভীর হ'লেও কিছু একরোখা, তাই শেষ পর্য্যন্ত জাতির ত্রাণকর্ত্তার বড় আসন তাঁর স্বদেশবাসীরা হয়তো তাঁকে দিতে পারবেন না।

জাতির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ-সাধনায় রামমোহনের সুর শেষ পর্য্যন্ত তাঁর পশ্চাদ্‌বর্ত্তীরা রাখতে পারেন নাই ; সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেম্‌নি মধুসূদন যে গ্রামে সুর ধরেছিলেন তা নেমে গেল। বঙ্কিমচন্দ্রই যখন নিজেকে দেশের কল্যাণের রাজপথে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারলেন না "অন্যে পরে

কা কথা”। তাই তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিকদের রচনার পরিমাণ যতই বেশী হোক, দশের করতালিতে যতই তাঁদের সাহিত্যিক জীবন মুখরিত হ’য়ে থাকুক, বাংলার চিত্তের উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য তাঁরা কিছুই করতে পারেন নাই বল্‌লে চলে; বরং ধর্ম্মের ক্ষেত্রে যে মধ্যযুগীয় ভাবোন্মত্ততা সুপ্রকট হ’য়ে উঠ্‌ল, নানা ভাবে তাকেই তাঁরা প্রদক্ষিণ করেছেন। *

(৮)

কিন্তু বাংলা দেশ এমনিতর একটা প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়েই চলেছে, বৃহত্তর জীবনের দিকে তা’র গতি রুদ্ধ, একথা বলতে গেলে সত্যের অপলাপ করা হ’বে। রামমোহন যে কর্ম্ম ও চিন্তার সূচনা ক’রে গেলেন ও তাঁর পরে কেশবচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্র-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভিতর দিয়ে তা’র যে একটি প্রতিক্রিয়া হ’লো, এসব বিরোধ কোনো এক বীর্য্যবান সামঞ্জস্যে উপনীত হয় নাই, ও তার জন্য বাঙালীর জাতীয় চরিত্র ও কর্ম্ম-ধারা একটা সুদর্শন বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করে নাই, এ সত্য; কিন্তু এ বিরোধ চুকিয়ে দিয়ে একটা উদার বীর্য্যবন্ত জাতীয়তার দিকে চোখ কারোই যে নাই তা সত্য নয়। জাতির এ নব প্রয়োজন দুইজন চিন্তা ও কর্ম্ম-বীরের জীবনের ভিতর দিয়ে ফুটেছে—একজন বিবেকানন্দ অপর জন রবীন্দ্রনাথ। বিবেকানন্দ পরমহংস রামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। রামকৃষ্ণের সাধনা ও সিদ্ধি ব্যাপারটী আমরা বুঝি আর নাই বুঝি কিন্তু এ সত্য যে তিনি বার বার জোর দিয়েছেন জগৎ-হিতের উপর। এ উপেক্ষা ক’রে বিবেকানন্দ মুক্তির প্রার্থী হয়েছিলেন, তার জন্য তিনি তাঁকে ধিক্কার

* প্রাক্‌রবীন্দ্র যুগের কোন কোন লেখক সম্বন্ধে (যেমন সুরেন্দ্র মজুমদার ও বিহারী লাল) আমাদের নূতন করে’ ভাববার সময় এসেছে; কিন্তু তাঁদের প্রভাব তাঁদের সমসাময়িকদের উপর নগণ্য ছিল সন্দেহ নাই।

দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের ভিতরে দোষ কম নয়,—প্রথমতঃ রবীন্দ্র-নাথের "গোরা"র মতো সব সময়ে তিনি যেন বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে লড়বার জন্য তৈয়ার, দ্বিতীয়তঃ সন্ন্যাস ও বেদান্তের তিনি গোঁড়া, তৃতীয়তঃ ব্রাহ্মদের যে তিনি নিন্দা করেছেন তাদের ঐতিহাসিক বোধ নাই বলে' সে অভিযোগটি তাঁর সম্বন্ধেও খাটে—ব্রাহ্মদের সংস্কারের প্রয়াসের কোনো অর্থ তিনি যেন পান নাই, অথচ তিনি নিজে একজন ছোটোখাটো সংস্কারক ছিলেন না ; চতুর্থতঃ ভারত আধ্যাত্মিক ইয়োরোপ জড়বাদী ভারতকে ইয়োরোপের আচার্য্য হ'তে হ'বে এই ধরণের কতকগুলো কথা প্রচার করে' স্বজাতির অন্তঃসারশূন্য দম্ভের সহায়তাই তিনি বেশী করেছেন ;—তবু মোটের উপর এই বীরহৃদয় সন্ন্যাসী সত্যকার স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন—হয় ত মানবপ্রেমিকও ছিলেন। তাই সেবাশ্রম প্রভৃতির সূচনা করে' জাতীয় জীবনে তিনি যে বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করেছেন জাতির চিত্ত-প্রসারের জন্য বাস্তবিকই তা অমূল্য ; এবং জাতীয় জীবনের দৈন্যের জন্য নানা ক্রটী বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই সব প্রতিষ্ঠান বাংলার হিন্দু যুবককে দেশের সত্যকার সন্তান হ'তে যে অনেকখানি সাহায্য করছে তাতে সন্দেহ নাই।

তারপর রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তার যে রূপ দিয়েছিলেন রবীন্দ্র-নাথ তা'র সঙ্কীর্ণতা ভেঙে তাকে বৃহত্তর করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু তাঁর আদর্শের অনুপ্রেরণা এ পর্য্যন্ত বাংলার জাতীয় জীবনে কমই অনুভূত হয়েছে ; এখন পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়ত্বের আদর্শই দেশের জন-সাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করে' রয়েছে, বলা যেতে পারে। রবীন্দ্র-নাথ কবি, তাও আবার সূক্ষ্ম-শিল্পী গীতিকবি ; তাই যে মহা-মানবতার গান তিনি গেয়েছেন আমাদের দেশের স্থূল-প্রকৃতি জন-সাধারণের জীবনে কত দিনে তা'র স্পন্দন জাগবে তা ভেবে পাওয়া দুষ্কর।

হিন্দুর নিজের ভিতরেই মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগের সংগ্রামের যখন এই চেহারা,—তখন আর এক সমস্যা দেখা দিয়েছে—হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা যে ভাবে উঠেছে তা একই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানের দুর্দ্দশার প্রমাণ। মুসলমানের দুর্দ্দশা এই জন্য যে এ সংগ্রামে সে যে ভাবে জয়ী হবার স্বপ্ন দেখে তা থেকে বুঝতে পারা যায় তা'র স্বপ্ন দেখারই অবস্থা। বাস্তবিক মুসলমানের অবস্থা খুবই বিস্ময়কর—এতদিন ধরে' পরিবর্ত্তিত অবস্থায় বাস ক'রেও তন্দ্রার ঘোরে দুই একটী প্যান-ইসলামী বোলচাল দেওয়া ভিন্ন পারিপর্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনরূপ জাগ্রত-চিত্ততার পরিচয় সে আজ পর্য্যন্ত দেয় নাই!—আর হিন্দুর জন্য আফ্‌সো-সের এই জন্য যে তা'র এত সংস্কার-চেষ্টা এত সাধনা সত্ত্বেও এই সমস্যার একটা মীমাংসা করবার সামর্থ্য তা'র হ'লো না। এই হিন্দু-মুসলমান সমস্যা যেন হিন্দু মুসলমান উভয়েরই আচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে বিধাতার জ্বালা এক তীব্র আলো,—এর ঔজ্জ্বল্যে আমরা দেখে নিতে পারছি—বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান ও কর্ম্মের উৎসবে আমাদের স্থান কোথায়।

বাংলার যে প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে তা অনেক সময়ে এমন সামান্য কারণে হয়েছে যা থেকে বুঝতে পারা যায় প্রাচীন সংস্কার বাঙালীর জীবনে কত বদ্ধমূল—চোখ খুলে' জগতকে দেখতে সে কত নারাজ। এরই সঙ্গে এ কথাটি স্মরণ রাখা দরকার যে বাঙালী এ পর্য্যন্ত তার চোখ খোলার সাধনার বড় সাধক রামমোহনকে মোটের উপর প্রত্যাখান করে' এসেছে।—এই প্রত্যাখানের কারণ সম্বন্ধে দুটি কথা বলা যেতে পারে,—প্রথমতঃ বাঙালী সাধারণতঃ ভাবপ্রবণ, আর রামমোহন লোকটি যেন আগা-গোড়া নিরেট কাণ্ডজ্ঞান, দ্বিতীয়তঃ বাঙালী হিন্দুর পরম আদরের

প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে তিনি বেশ উঁচু গলায় কথা বলেছেন।—এই প্রতিবাদকারী অথচ মহাপ্রাণ রামমোহনকে বাঙালী হিন্দু শেষ পর্য্যন্ত কি ভাবে গ্রহণ করবে বলা সহজ নয়। কিন্তু বিশ্ব-জগতের দিকে বাস্তবিকই যদি তা'র চোখ পড়ে তা'হ'লে সে হয়ত দেখবে—এই প্রতিবাদকারীর কথার ভিতরেই সত্যের পরিমাণ বেশী, তাই তাঁর পথ-নির্দ্দেশই অনেক পরিমাণে কল্যাণ-পথের নির্দ্দেশ। তা ছাড়া রামমোহনকে গ্রহণ করা বাঙালী হিন্দুর জন্য যে শুধু আয়াস-সাধ্যই হ'বে এটি সঙ্গত নয় এই জন্য যে রামমোহনও বাঙালী-সন্তান, শুধু তাই নয়, তাঁর বিশাল দেহের ভিতরে যে চিত্তটি ছিল সমস্ত অভিনবত্ব সত্ত্বেও তা বাঙালীরই কোমল চিত্ত।

মনে হয়, বাঙালীর রামমোহনকে গ্রহণ করার সব চাইতে বড় অন্তরায় এইখানে যে সে সাধারণতঃ ঘর-মুখো আর রামমোহন আবাল্য ঘর-মুখো ছিলেন না। এই বাহির-মুখো হওয়ার সাধনাই হয়ত বর্ত্তমান বাঙালী জীবনে বড় সাধনা—হয়ত এরই সাহায্যে সবলতর কাণ্ডজ্ঞান শ্রেষ্ঠতর পৌরুষ ইত্যাদি কল্যাণ-পথের সম্বল আহরণ তা'র পক্ষে সহজ হ'বে। আর এই বাহির-মুখো হওয়ার উপায়ও তার অতি নিকটে। দৈব ঘটনায় বহু জাত বহু সম্প্রদায় দেশের বুকে এক জায়গায় মিলেছে, সেই মিলনকে অন্তরের দিক দিয়ে সার্থক ক'রে তোলাই হচ্ছে বাহির-মুখো হওয়ার বড় উপায়—বাঙালীর সৌভাগ্য-রূপী তার এ যুগের কবি বার বার একথা বলেছেন।

এরই সঙ্গে মুসলমানের জাগরণ যদি সত্য হয়, তাহ'লে কিছু বেশী সুফল লাভের সম্ভাবনা। যে গুরু তা'কে উপদেশ দিয়েছেন—ক্ষুধা লাগ্‌লে খেয়ে নামাজ পড়ো, তাঁর অনুবর্ত্তিতায় বস্তুতন্ত্র হওয়া তা'র পক্ষে

স্বাভাবিক। আবার সেই জন্যই বস্তুর শিকলে বন্দী হওয়াও তা'র পক্ষে কম স্বাভাবিক নয়। ফলে মুসলমানের হয়েছেও তাই।—এই মনের বন্ধন সহজ ভাবে চুকিয়ে দিয়ে মুসলমান নব মানবতার ধ্বজা বহন করবার যোগ্য হ'বে কিনা, অথবা কতদিনে হ'বে, জানি না। যদি হয়, তবে বাংলার কর্ম্ম ও চিন্তার ক্ষেত্রে তার দান কম হ'বে না ;—তা হ'লে স্বাপ্নিক হিন্দু ও বস্তুতন্ত্র মুসলমান এ দুয়ের মিলনে বাংলার যে অভিনব জাতীয় জীবন গঠিত হ'বে——তার কীর্ত্তি-কথা বর্ণনা করবার ভার ভবিষ্যৎ সাহিত্যিকের উপর থাকুক।

৫'

"মুস্‌লিম সাহিত্য সমাজে"র দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত। ফাল্‌গুন, ১৩৩৪

চলার কথা

ওঠো—জাগো—হায় ইসলাম—হায় মুসলিম,—জামালুদ্দিন-সারসৈয়দ-আমিরআলি থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্য্যন্ত অন্তহীন বক্তৃতায় উপদেশে সাহিত্যিক-প্রচেষ্টায় কত কণ্ঠে কত সুরেই ত এ কান্না শোনা গেল। —আর কত ?

এখন মনে হয়, আমাদের বহু খেয়ালের মতো এ কান্নাও হয়ত এক সৌখীন খেয়াল—এক মানসিক বিলাস—দুর্ব্বল-প্রকৃতি নারীর জন্য বিলাস যেমন তার দীর্ঘকালব্যাপী শোকোচ্ছ্বাস।—জানি, প্রভাতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙ্‌লেও শয্যার মায়া ত্যাগ করতে মানুষের কিছু দেরী হয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শয্যা ত্যাগ তাকে ত করতেই হয়, কাজেও সে লেগে যায়। আলোয় ঘর ভরে' গেলেও শয্যা-ত্যাগের সৌভাগ্য যার হয় না তাকেই আমরা বলি রুগ্ন।

* * *

কিন্তু শক্ত প্রশ্ন এই :—একটা জাতি বা সম্প্রদায়ের জাগার কি অর্থ ? কিইবা সঙ্কেত ?

এসব প্রশ্ন যাঁরা উত্থাপন করেন তাঁরা অনেক সময়ে এই ভেবে কিছু তৃপ্তি পান যে অপরিণামদর্শী অস্থির উৎসাহীর উৎসাহের বাড়াবাড়ি এই সব প্রশ্ন দিয়ে তাঁরা কিছু শায়েস্তা করতে পেরেছেন।—তা তৃপ্তি তাঁরা পা'ন, কিন্তু প্রশ্নটি তাঁরা যে এত শক্ত মনে করেন সেটি হয়ত তাঁদের

নিজেদেরই ত্রুটির জন্য,—আসলে প্রশ্নটি অত কঠিন নাও হ'তে পারে। —এ প্রশ্নের উত্তরে কেউ যদি বলেন,—জাগার অর্থ জাগা,—ঘুম ভাঙার অর্থ যেমন চোখ খুলে চাওয়া, ইন্দ্রিয়-গ্রামের সচেতন হওয়া, একটি জাতি বা সম্প্রদায়ের জাগার অর্থও তেম্‌নি অপর দশটি জাতি বা সম্প্রদায় কেমন করে' খেয়ে পরে' বেঁচে আছে তা দেখা আর নিজেদের ভাল খাওয়া-পরার জন্য সচেষ্ট হওয়া——তা হলে এ প্রশ্নের একটা উত্তর দেওয়া হলো না কি?

কিন্তু উত্তরটি এত সোজাসুজি এত নিরাভরণ যে তাতেই অনেকের মনের খুঁৎ খুঁৎ মিট্‌তে চায় না, কেবলই সন্দেহ হয়—অনেক কিছুই হয়ত বা র'য়ে গেল। হিং টিং ছটের একটা জবরদস্ত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা না হ'লে আমাদের মন ওঠে না।

কিন্তু আসলে জাগার এই-ই অর্থ—এই খাদ্যান্বেষণে সচেষ্ট হওয়া। Man shall not live by bread alone যাঁরা বলতে চেয়েছেন তাঁরা একটা-কিছু বলতে চেয়েছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু মনে হয় bread কথাটার এমন একটা সঙ্কীর্ণ অর্থ তাঁরা দিয়েছেন যা না দিলেই হতো ভাল। ধর্ম্ম শিল্প সাহিত্য রাষ্ট্র এ সব এই খাদ্যান্বেষণেরই বিচিত্র ভঙ্গিমা—'অনুশোচনা-গ্রস্ত নয় আহার-পুষ্ট অ-ভীত মানবতার জয়যাত্রার ইতিহাস।

* * *

অনেক সভায় অনেক মুসলিম বক্তাকে ইসলামের অতীত ইতিহাসের গৌরবকাহিনী আবেগপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করতে শুনেছি। শুনে হাসি পেয়েছে। সে যেন বালকের মুখে যুবক যুবতীর প্রেমকাহিনীর বর্ণনা! তাতে নেশা ধরবে কেন!

কদ্‌রে গওহর্‌ শাহ্‌ বেদানাদ্‌ ইয়া বেদানাদ্‌ জওহরী।
রত্নের কি কদর তা জানে বাদশাহ্‌ অথবা জহুরী।

……উৎসবের যে আনন্দ তা কি উৎসব-শেষের এঁটো পাতার পরিমাণ ক'রে বুঝতে পারা যায়! উৎসবের আনন্দ বুঝতে চাও? তা হ'লে আয়োজন কর নব উৎসবের। আর সে-আয়োজনের যোগ্যতা আছে তার যে দেউলিয়া নয়, হা-হুতাশ-আচ্ছন্ন নয়, যে প্রসন্ন, যে সমৃদ্ধ, রুদ্ধ নয় উন্মুক্ত যার ধনাগমের উৎস-মুখ।

* * *

অতএব?—অতএব অতীতকে জানো অতীত বলে', মৃত বলে'। তার যে অংশ সজীব সে তুমি। শুধু তোমার মুখেই অতীত কথা বলতে পারে,—পণ্ডিতের মুখে অতীত যে সময় সময় কথা বলে সে Ventriloquism।—ইসলাম কি, মুস্‌লিমত্ব কি, তারও সত্যকার পরিচয় পাবে অতীতে নয় তোমারই জীবনে। তুমি বুদ্ধিমান কর্ম্মানুরত সমাজ-ধর্ম্মী মানুষ হও, পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের বিকাশ কোনো মায়ার ছলনায় তোমার ভিতরে ব্যাহত না হোক্‌,—তুমিই হ'বে ধার্ম্মিক রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ সাংসারিক রূপদক্ষ; মুসলমানত্ব হিন্দুত্ব খৃষ্টানত্ব এ সব-কিছুর রূপ ফুটবে তোমারই ভিতরে।

পৌষ, ১৩৩৫

বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা

সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁরা কিছু বল্‌তে যাবেন তাঁরা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করবেন সাহিত্য-তত্ত্ব, অর্থাৎ রস কি কাব্য কি কবি কে এই সব, আমাদের দেশের পাঠক-সাধারণ এ আশায় অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। কিন্তু লেখক-সাধারণ দুঃখের সহিতই জানেন, সংস্কৃত অথবা ইংরেজি বচনোদ্ধার তাঁরা যতই করুন কাজটা আসলে বড় শক্ত—হয়তো বা অসম্ভব।—তা হোক না খুব শক্ত, এমন কি অসম্ভব-ঘেঁষা, তবু সাহিত্যিক-দের এই সাহিত্যতত্ত্বরূপী স্বর্ণ-মৃগের পশ্চাদ্‌ধাবন অসঙ্গত বা অশোভন নয়, কেননা স্বর্ণমৃগ আয়ত্তের বহির্ভূত হতে পারে কিন্তু তাকে উপলক্ষ্য করে' যে প্রয়াস যে দুঃখভোগ যে অন্তর্দাহ তার ভিতরে পুটপাক হয়ে কোনো অমৃত তাঁদের জন্য উচ্ছলিত হবে কিনা কে জানে।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যিকদের জন্য বিষয়টা আরো কিছু জটিল। সত্য বটে এমন কিছু চিন্তা-ভাবনা কিছু রূপাঙ্কন বাংলা সাহিত্যে আমরা পেয়েছি যা অমৃতমাখা—মানুষের চিত্তের জন্য এক উপাদেয় খাদ্য। কিন্তু তার পরিমাণ ও রকমারিত্ব এখনো বড় কম—এত কম যে তাই থেকে সাহিত্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে নব নব প্রেরণালাভ অসম্ভব না হলেও দুঃসাধ্য নিঃসন্দেহ। ইংরেজী প্রভৃতি সাহিত্যে যাঁরা কাব্যজিজ্ঞাসু তাঁরা অবশ্য তাঁদের অনুসন্ধিৎসা শুধু ইংরেজী সাহিত্য-ক্ষেত্রেই আবদ্ধ রাখেন না, কিন্তু সেই সাহিত্যই যে তাঁদের মুখ্য প্রেরণাস্থল সে সম্বন্ধে বাক্যব্যয় বোধ হয় অনাবশ্যক। তাছাড়া ইংরেজী ভিন্ন অন্যান্য যে সব সাহিত্য থেকে তাঁরা উপকরণ সংগ্রহ করেন, যেমন গ্রীক ও রোমক সাহিত্য, সে-সবের সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সম্বন্ধ এত নিকটবর্ত্তী যে বাংলা

সাহিত্যের সঙ্গে তেমন নিকট সম্বন্ধ কোন্ সাহিত্যের অথবা কোন্ কোন্ সাহিত্যের সেইটিই একটি বড় অনুসন্ধানের বিষয়।

কথাটা কারো কারো কাছে অদ্ভুত শোনাতে পারে, কেননা বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের পরিমাণই যে বেশী শুধু তাই নয়। তবু এ কথাটা বাস্তবিকই অদ্ভুত নয়। মধুসূদনের আগেকার যে বাংলা কাব্য, যেমন ভারতচন্দ্রের অথবা বিদ্যাপতির কাব্য ও কতকাংশে চণ্ডীদাসের কাব্য, বলা যেতে পারে, মুখ্যভাবেই হোক আর গৌণভাবেই হোক, সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রভাব তার উপর বেশী। কিন্তু মধুসূদন থেকে বাংলার যে নব সাহিত্যের সূত্রপাত তার সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় কি? নব বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ তেমনই প্রচুর, হয়তো বা প্রচুরতর, সংস্কৃত শব্দালঙ্কার সংস্কৃত দার্শনিক পরিভাষা এসবও বাংলার নব সাহিত্যের রথীদের প্রীতির সামগ্রী, কিন্তু এসব, যাকে বলা হয়, বাইরের সাজসজ্জা—ভেতরকার আসল কবি-মানুষটী যে বদলে গেছে!

কথাটা আরো কিছু পরিষ্কার করে' বলা যেতে পারে। কালিদাস-ভারবি-প্রমুখ সংস্কৃত কবিদের আর্থিক অভাব-অভিযোগের তাড়না ভোগ করতে হতো কি না সে তত্ত্ব আমাদের অজ্ঞাত, কিন্তু তাঁদের কাব্যের ভিতরে যে চিত্ত প্রতিফলিত দেখতে পাওয়া যায় সেটি বড় শান্তিপূর্ণ—উদ্বেগরহিত। অর্থাৎ, ধর্ম্ম সমাজ ইহকাল পরকাল ইত্যাদি নিয়ে মানুষের চিত্ত যে সময় সময় আন্দোলিত হয়—এ কালের মানুষ এ আন্দোলনের হাত থেকে যেন আর নিষ্কৃতিই পা'চ্ছে না—এই সব সংস্কৃত কবি সে বিক্ষোভ দ্বারা যেন অস্পৃষ্ট। কিন্তু মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ—আমাদের একালের সাহিত্যের দিক্‌পাল—এঁদের মনোজীবনে সে আরাম কোথায়! সত্য বটে

মধুসূদনের জীবন বহু বিপর্য্যয়ে বিপর্য্যস্ত হলেও তাঁর কাব্যের মর্ম্মকোষে যে চিত্তটি বিরাজ করছে সেটি প্রসন্ন—ঠিক আনন্দ না হলেও শান্তি-পূর্ণ। কিন্তু তাঁর যে নব-আবিষ্কৃত ছন্দলোক—কত অভিনব সামগ্রী সেই বিরাট হার্ম্মনি! কত বিক্ষোভ কত দুঃখ কত প্রেম কত মাধুর্য্য তাকে এই অপরূপতা দান করেছে! মধুসূদন নিজে বলেছিলেন গ্রীক দেবদেবীদের তিনি পরিয়ে দেবেন হিন্দু দেবদেবীর পোষাক,—কত নব নব সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে তাঁর এই উক্তির সার্থকতা লাভের ভিতরে তাই-ই ভাববার বিষয়।

আর বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। "ভাষা ও ছন্দ" কবিতাটিতে বাল্মিকির কবিপ্রেরণা লাভ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

কী তাহার দুরন্ত প্রার্থনা,
অমর বিহঙ্গশিশু কোন্ বিশ্বে করিবে রচনা
আপন বিরাট নীড় ?......................

বঙ্কিম-রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে এই কথাই বার বার আমাদের মনে হয়। একাধারে এঁরা কবি, দার্শনিক, সমাজসংস্কারক, রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ, ভাষা-সংস্কারক, ধর্ম্ম-সংস্থাপক!—আর তাও অজ্ঞাতসারে নয়, সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে—হৃদয়রক্ত নিঃশেষিত করে'!

কাব্য সম্বন্ধে সেকালের সংস্কৃত উক্তি—

কাব্যং যশসে অর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে,—

আর একালের বাংলা উক্তি—

কত প্রাণপণ,— দগ্ধ হৃদয়,
বিনিদ্র বিভাবরী,—
জান কি বন্ধু উঠেছিল গীত
কত ব্যথা ভেদ করি?

এই দুই কাব্য-জগতের যে ব্যবধান তা শুধু বিপুল নয়, কোনো কোনো দিক দিয়ে হয়তো বা দুর্লঙ্ঘ্য।

এই জন্ম শান্তি নয় সংগ্রাম-ধর্ম্মী যে ইয়োরোপীয় সাহিত্য তার সঙ্গে মিলিয়ে বাংলার নব সাহিত্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার করতে আমাদের কোনো কোনো সমালোচক যত্নপরায়ণ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এখানেও মুশ্‌কিল কম নয়। ইয়োরোপীয় সাহিত্য ইয়োরোপবাসীর কাছে এক জীবন্ত ব্যাপার। সেই জীবনের প্রয়োজনে সেই সাহিত্যের, অর্থাৎ কাব্য ও কাব্যজিজ্ঞাসা দুয়েরই, আকৃতি-প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সেখানে হচ্ছে। এত দূর থেকে সেই জীবন ও পরিবর্ত্তন-প্রবাহের সমঝদারী আমাদের জন্ম খুবই দুরূহ সন্দেহ নাই। তাই ইয়োরোপীয় সমালোচনা-শাস্ত্র নিয়ে আমাদের ভিতরে যাঁরা কিছু ব্যস্ত-সমস্ত ইয়োরোপের সেই অনুদিন-বর্দ্ধমান কাব্যজিজ্ঞাসার পরিবর্ত্তে অনেক সময়েই যে তাঁদের লাভ হবে বিভিন্ন ধরণের কিছু কিছু "কোটেশন" তা অস্বাভাবিক বা অসাধারণ কিছু নয়।—কিন্তু এর অসাধারণত্বও আছে—এই "কোটেশন"-সমালোচনাও মাঝে মাঝে বাংলা সাহিত্যে ভীতির সঞ্চার করে এসেছে।

কিন্তু বলা যেতে পারে, ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে একালের বাংলা সাহিত্যের মিল যখন বেশী তখন যতটা সম্ভব ইয়োরোপীয় কাব্যজিজ্ঞাসার মূল সূত্রগুলি আয়ত্ত করা ভিন্ন আমাদের নব সাহিত্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার করবার আর কি মানদণ্ড আছে? বলা বাহুল্য আমাদের অনেক সমালোচকেরই মোট বক্তব্য এই—যদিও সত্যকার সাহিত্যরসিকদের বুঝতে একটুও দেরী হয় না এই মনোভাব কত হেয়। এ হচ্ছে অনুকরণের

মনোভাব,—আর অনুকরণ করে' যেমন কবি হওয়া যায় না, অনুকরণ করে' তেমনি কাব্যজিজ্ঞাসুও হওয়া যায় না। সত্য বটে ইয়োরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে সৃষ্ট আমাদের নব সাহিত্য। কিন্তু সেই প্রভাবের কথাই ত এর সবখানি কথা নয়। বরং প্রকৃত কথা এই—এক ভিন্ন পরিবেষ্টনে ইয়োরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে সৃষ্ট এই সাহিত্য। এই অভিনবত্বটুকু না বুঝলে একালের বাংলা সাহিত্যের কিছুই বোঝা হয় না।

যাঁরা একালের বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা তাঁরা যে এই অভিনবত্বের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত ছিলেন তা নয়। মধুসূদন ত ইয়োরোপীয় কাব্যকলা বরণ করেছিলেন প্রাণের দোসর রূপে। কথিত আছে, তাঁর স্ত্রীর কণ্ঠে ফরাসী গান শুনে তিনি অশ্রুবিসর্জ্জন করেছিলেন। তবু তাঁর রাবণ মেঘনাদ অথবা রাম লক্ষ্মণ সীতা বিভীষণ হোমরের প্রায়াম হেক্টর অথবা আগামেম্‌নন নেস্‌টর হেলেন ইউলিসিসের অনুকৃতি হয়ে ওঠে নাই, এমন কি এরা ইয়োরোপীও নয়,—সমস্ত নূতনত্ব সত্ত্বেও এরা সেই একধরণের বাঙালী। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ অবশ্য জাগ্রতভাবে বাংলার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তাঁদের সাহিত্যে। কিন্তু জ্ঞাতসারে বাংলার বৈশিষ্ট্যসাধন তাঁরা যতটুকু করতে চেয়েছেন তাঁদের অজ্ঞাতসারে তার চাইতে মহত্তর বৈশিষ্ট্য বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী জীবন তাঁদের প্রতিভা থেকে লাভ করেছে।—এই যে আমাদের সৌভাগ্য এর জন্য পর্য্যাপ্তিবোধ অশোভন নিশ্চয়ই, কিন্তু এ বিষয়ে উদাসীন হয়ে পরধনলোভে মত্ত হলে তা হয় শোচনীয়।

কিন্তু প্রশ্ন হবে—কি সেই নব বাংলা সাহিত্যের অভিনবত্ব?—কি তার স্বরূপ?

এ প্রশ্নের খুবই সন্তোষজনক উত্তর কেউ যদি দিতে পারেন তবু বাংলার অন্যান্য সাহিত্যসেবীর সেজন্য অব্যাহতি মেলে না। তাই বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এমন একটা প্রশ্নের অবতারণাই আমাদের জন্য সব চাইতে বড় লাভ। হয়তো এই প্রশ্নের আঘাতেই বাংলার জীবন ও সাহিত্য-সমস্যার নব নব দ্বার আমাদের জন্য উদ্‌ঘাটিত হবে। এর উত্তর বাংলার সাহিত্য-দরবারে, তথা বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে, পেশ করতে চেষ্টা করবেন বিভিন্ন সাহিত্যিক তাঁদের শক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে। আমি যেটুকু বুঝতে পেরেছি তা নিবেদন করতে চেষ্টা করব।

শোনা যায়, বাংলা দেশ এক সময়ে জলমগ্ন ছিল। তখন সমুদ্রের তরঙ্গ তার বুকের উপর খেলা করত। সেই তরঙ্গভঙ্গের ভিতর দিয়ে আস্তে আস্তে বাংলা নিজেকে প্রকাশ করেছে। বাংলার লোকদের জীবনেও তেম্‌নি বহুবার বহু ভাব-প্লাবন এসেছে। আর্য্য দ্রাবিড় কোল মঙ্গল বৌদ্ধত্ব হিন্দুত্ব এসব ত ছিলই, তার উপর এসেছে মুসলমান-প্লাবন তার নবাবী বাদসাহী শরিয়ত মারেফাত এই সব নিয়ে; তার উপর এসেছে ইয়োরোপীয় প্লাবন তার বাণিজ্য রাজনীতি ফরাসী বিপ্লবের বার্ত্তা খৃষ্টধর্ম্ম সাহিত্য বিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে। অবশ্য এমন বৈচিত্র্য যে বাংলারই বৈশিষ্ট্য তা নয়; প্রায় সব দেশেরই ইতিহাস যথেষ্ট বিচিত্র। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে এই সব বিচিত্র উপকরণের কেমন এক জৈব মিলন ঘটেছে—এ মিলন সব দেশে সব সময়ে ঘটে না—এ কালের বাংলা সাহিত্যে ফুটে উঠেছে বাংলার এই নব-গঠিত মানসলোকের শ্রী!—বাংলার নব ধর্ম্মাচার্য্যবৃন্দ নব সাহিত্যরথিবৃন্দ এঁদের সবারই জীবনে প্রাচীর ও প্রতীচীর বিচিত্র সাধনার সমাবেশ ঘটেছিল বাংলার শিক্ষিত লোকেরা তা জানেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকের কাছে এই সমাবেশ বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ এইজন্য যে এতে

এই অগ্রণীদের জীবনই এক আশ্চর্য্য সুষমামণ্ডিত হয় নাই, বরং এঁদের ভিতর দিয়ে বিজ্ঞাপিত হয়েছে সমগ্র বাঙালী জীবনের জন্য এক নব সূচনা; এঁরা যেন পর্ব্বতশীর্ষ—নব প্রভাতের সুপ্রসন্ন আশীর্ব্বাদে প্রথম উজ্জ্বলিত এঁদের ভালদেশ।

বলেছি, এই বৈশিষ্ট্য সাধনের জন্য খুবই চেষ্টিত আমাদের মনীষীরা যে হয়েছিলেন তা নয়। এমনকি তাঁরা অনেক সময়ে কেমন করে' যেন একে আচ্ছন্ন করতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টান্ত ধরা যাক। তিনি ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিন্দুধর্ম্মের স্থান নির্দ্দেশ করেছেন সব ধর্ম্মের উপরে। কিন্তু বেদের বহু উর্দ্ধে তিনি যে গীতার স্থান নির্দ্দেশ করেছেন এতেই তাঁর হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দুর ভক্তির চাইতে সংশয় জাগায় বেশী। তেমনিভাবে তাঁর প্রফেট ষ্টেটস্‌ম্যান ও বৈজ্ঞানিক-বিচারে-পূর্ণাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত হিন্দুর বিস্ময়ের সামগ্রী। অথচ এসব বঙ্কিম-চন্দ্রের খেয়ালী সৃষ্টি নয়; তাঁর জিজ্ঞাসায় তীব্রতা যথেষ্ট।—তাঁকে যদি বলা হয় কঁৎ-স্পেন্সার-সিলি-বেন্থামের হিন্দুবেশী শিষ্য তাতেও ঠিক কথাটি বলা হয় না; কেননা এই সব পাশ্চাত্য মনীষীর মতো পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকতা তাঁর বড় লক্ষ্য নয়।—আসলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সৌন্দর্য্যবোধ ও অনুসন্ধিৎসা, প্রবল স্বদেশকল্যাণ-কামনা ও কিছু মোহ, সমস্ত নিয়ে বিশেষ-ভাবে একজন Man of faith—কল্যাণজিজ্ঞাসু কর্ম্মী—তাই দেশের জীবনের এক সন্ধিক্ষণে তাঁর এই আলো ও অন্ধকার উদ্‌গীরণকারী অদ্ভুত প্রতিভা থেকেও কিছু নির্দ্দেশ লাভ হয়েছে—কি কল্যাণ কি পথ, কি গ্রহণীয় কি বর্জ্জনীয়।

আর রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রতিভা তাঁর সমসাময়িকদের কাছে পূর্ণাঙ্গ অনবদ্য বিবেচিত হবে এ স্বাভাবিক। কিন্তু কোন কিছুরই পূর্ণাঙ্গতালাভে

প্রকৃতির বোধ হয় আপত্তি। তাই পরবর্ত্তীকালের সাহিত্য-রসিকেরা হয়ত দেখ্‌বেন, যে বিশ্বপ্রেমের জন্য এই কবির কোনো কোনো স্বদেশ-বাসী তাঁর প্রতি অনুরক্ত অথবা বিরক্ত হয়েছেন সেই প্রকাণ্ড বিশ্ব-প্রেমের চাইতে অপ্রকাণ্ড স্বদেশ-প্রেম বা বঙ্গ-প্রেম তাঁর ভিতরে কত নিবিড়! সেজন্য তাঁর প্রতিভা তাঁদের কাছে কম গৌরবের হতে পার্‌ত, কিন্তু কবির নিজের ও তাঁর স্বদেশবাসীদের সৌভাগ্য এই যে কবির জন্মগত সত্যের আকর্ষণ মহাজীবনের আকর্ষণ তাঁর সমস্ত আরাম ও তুচ্ছতাপ্রীতির ভিতরে বার বার জয়ী হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে এই যে সত্যের আকর্ষণের ছবি, এই যে সৌন্দর্য্যপ্রিয়, আরামপ্রিয়, স্বদেশ স্বজাতি ও স্বকালের সঙ্গে নিবিড় স্নেহের যোগে যুক্ত, কবি বার বার উন্মনা হয়ে উঠছেন সত্যের আহ্বানে, ও শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত মোহপাশ অপসারিত করে' নত মস্তক হতে পেরেছেন সত্যের সাম্‌নে,—এই অপরূপ জীবন-আলেখ্য,—এরই জন্য মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যুজ্জ্বল প্রতিভার চাইতে তাঁর প্রতিভা তাঁর দেশ ও জাতির জন্য বেশী অর্থপূর্ণ হয়েছে।

······একটা দেশের লোক বহুকাল ধরে' বাস করে' আসছিল অনেক-খানি জড়ধর্ম্মের ধর্ম্মী হয়ে। সময়সময়ের চিত্তোচ্ছ্বাস সত্ত্বেও একটা অপ্রবল জীবন অপ্রচুর জীবনায়োজন এইই ছিল জগতের সামনে তাদের পরিচয়। সেই জীবনে কোথা থেকে জেগেছে নব সাধ—নব স্বপ্ন!—পাড়াগাঁয়ের ব্যাপারি যেন আলাউদ্দিনের প্রদীপের দৈত্যের সাহায্যে রাতারাতি হয়ে উঠেছে বিশ্বের বন্দরের সওদাগর!—গ্রাম্য সমাজের অন্ধ গতানুগতির পরিবর্ত্তে জগৎ-সমাজের সাহিত্য ধর্ম্মতত্ত্ব সৌন্দর্য্য বিজ্ঞান সমাজনীতি রাজনীতি তার অবলম্বন ও উপজীবিকা!······

বাংলার সাধারণ জীবনের সঙ্গে বাংলার সাহিত্যের জীবনের এই প্রভেদ।—এই সাহিত্যকে বিশেষিত করা যেতে পারে idealistic বলে'। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে idealism-এর সুখস্বপ্ন এর মর্ম্মকথা নয়। এ তার চাইতে বীর্য্যবন্ত। এ বরং prophetic—বাংলা যা হবে বা তাকে যা হতে হবে তারই সূচনা এতে। —সব সাহিত্যেরই দোষ ত্রুটি থাকে; একালের বাংলা সাহিত্যেরও আছে। হয়তো বড় সাহিত্যের তুলনায় কিছু বেশী আছে। কিন্তু গণনার বিষয় এর ত্রুটি নয়, এর প্রাণশক্তি—এর অর্থ ও সম্ভাবনা।—কিন্তু এ কালের বাংলা সাহিত্যের এই অর্থ ও সম্ভাবনা-জিজ্ঞাসায় বাংলার "কাব্যরসিক"রা আশ্চর্য্য ক্ষীণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন!

কিন্তু তাঁদের এত নিন্দা করে' লাভ নাই। সমালোচকরা মোটের উপর দেশের পাঠকদের প্রতিনিধি। তাই তাঁদের দোষ তাঁদের একলার দোষ নয়। সে দোষ হয়ত গোটা পাঠকসমাজের।

আসলে ব্যাপারটাও তাই। সত্যকার সাহিত্যিক বোধ ও রুচি বাংলার পাঠকসমাজে খুব কমই প্রসারলাভ করতে পেরেছে। এ ব্যাপারে আশ্চর্য্য ভাবে সফলকাম হয়েছেন আমাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা নন—আমাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সাহিত্যিকরা। তাঁদের পরিচয়স্বরূপ বলা যেতে পারে, মধুসূদন বলতে তাঁরা বুঝেছেন—পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ, বঙ্কিমচন্দ্র বলতে বুঝেছেন—হিন্দুত্বের পুনরুত্থান, আর রবীন্দ্রনাথ বলতে বুঝেছেন—Idealism, Mysticism—অর্থাৎ কিছু কবি কবি ভাব।

আর এই সাহিত্যসমঝদারি নিয়ে বাংলার পাঠকসমাজ মোটের উপর

আরামেই ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সে আরাম ভেঙে দিতে চাচ্ছে, অথবা দিয়েছে—"অতি-আধুনিক সাহিত্য"।

এই "অতি-আধুনিক সাহিত্য" বা "তরুণ সাহিত্য" বাঙালী জীবনে মহা চাঞ্চল্যের সূচনা করেছে। এর প্রশংসা হয়তো এর লেখকদেরই মুখে, তাঁদের গণ্ডীর বাইরে দুই চার জন প্রসন্ন পাঠকও হয়ত আছেন। কিন্তু বাদবাকি সমস্ত বাঙালী, লেখক পাঠক নির্ব্বিশেষে, এর উপর অসন্তুষ্ট। তাঁদের এত অসন্তোষের কারণনির্ণয় কিন্তু খুব সহজ নয়; কেননা "তরুণ সাহিত্যে"র যে সব অতিচার অনাচারের দিকে তাঁরা অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করেন সহজিয়া ও কবি খেউড়ের বাংলা দেশে ও বাংলা সাহিত্যে তা পূরোপূরি নতুন নয়। তবে "তরুণ সাহিত্যিক"দের বড় অপরাধ হয়ত এই যে বাংলার ভদ্র-সাধারণ একটা শতছিদ্রপূর্ণ অথচ ভব্যতামণ্ডিত জীবন নিয়ে কিছু নিরুদ্বেগে দিন কাটাচ্ছিলেন, এই "তরুণ"রা সেই ক্ষণভঙ্গুর ভব্যতার আবরণ নিয়ে নেহাৎ অল্পমতির মতো টানা হিঁচড়া আরম্ভ করেছেন।

আমি নিজে "তরুণ"দের সাহিত্য সম্বন্ধে ভাল মন্দ কিছুই বলতে চাই না; কেননা, মনে হয়, তা অনাবশ্যক। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর যে বুদ্ধি বিবেচনা নীতি রুচি "তরুণ সাহিত্যিক"রা মোটের উপর তার চাইতে বেশী ভাল বা বেশী মন্দ নন। "তরুণ"দের নবইয়োরোপ-প্রীতি ও অতরুণদের প্রাচীনভারত-প্রীতি একই মনোভাবের এপিঠ আর ওপিঠ। কিন্তু মনে হয় বাংলার ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের কাছে এই "তরুণ"দের চেষ্টাই হবে বেশী অর্থপূর্ণ; কেননা যে ধ্বংশ বাংলার সমাজজীবনে অবশ্যম্ভাবী—এবং সেই পথেই হয়ত কল্যাণ—এই "তরুণ"দের প্রচেষ্টায়

ফুটতে চাচ্ছে সেই ধ্বংশেরই রূপ। রচনাবিষয়েও এই "তরুণ"দের কারো কারো ভিতরে দেখা যাচ্ছে তাঁদের অতরুণ নিন্দুকদের চাইতে কিছু বেশী শক্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যেতে পারে নজরুল ইসলামকে অথবা প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। নজরুল ইসলামকেই ধরা যাক। তাঁর রচনা বহু-ত্রুটিপূর্ণ নিঃসন্দেহ। কিন্তু তবু তাতে আঁকা পড়েছে একটী তাজা মনের অভিমান-উন্মাদনার আশা-আনন্দের ছাপ। অর্থাৎ, এ কাব্য-ফুল তাজা গাছের ফুল—হোক্ না বন্যফুল। কিন্তু এর পাশে দুই চার জন অতরুণ শিক্ষিত কবির রচনা দাঁড় করালে দেখা যাবে, তাতে না আছে রং না আছে গন্ধ। রঙের আভাস যেটুকু লাগে তা প্রলেপ; গন্ধও দুই এক ঝলক যা পাওয়া যায় তা প্রক্ষেপ;—আসলে এ কাগজের ফুল।

বাস্তবিক, বাংলা সাহিত্যে "তরুণ"দের অজ্ঞতা ও মস্তিষ্কহীনতা আসল সমস্যা নয়; আসল সমস্যা বরং সাধারণ বাঙালী জীবনের জড়তা ও স্বল্প-তুষ্টি বা অন্ধতা—তরুণদের পূর্ব্ববর্ত্তী আরামপ্রিয় অকর্ম্মণ্য খেয়ালী কবি-ও সমালোচক-নিবহ যার প্রতীক—আর "তরুণ"রা একই সঙ্গে যার ভয়াবহ পরিণতি ও ক্ষীণ প্রতিক্রিয়া।—এই সাধারণ বাঙালী জীবনের অবাঞ্ছিত চেহারা বদলে দেওয়াই একালের বাংলা সাহিত্যের এক বড় কাজ। কিন্তু এ কাজ এখনো অসম্পন্ন।

প্রাকৃতিক নিয়মে যে জলধারা পাহাড় থেকে নেমে এসে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় তারই কূলে কূলে লোকের বসতি জমে, সভ্যতার বিকাশ ঘটে। বাংলার বুকে যে ভাবগঙ্গা প্রবাহিত হয়েছে তারই কূলে কূলে ফুটবে বাংলারও জাতীয় জীবনের শ্রীছাঁদ। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন আমাদের সমস্ত ঔদাসীন্য ও তুচ্ছতাপ্রীতি সর্ব্বান্তঃকরণে দূর করে' দিয়ে এই ভাব-

নদী যে আমাদের বহুদেশদেশান্তরের বিচিত্র সম্পদ সম্ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করেছে সেই মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন হওয়া। এম্‌নিভাবে, শুধু সাহিত্য-চর্চ্চা নয়, ব্যাপকভাবে জীবন-চর্চ্চাতেই আমাদের নব সাহিত্যের প্রকৃত সার্থকতা। আর এইভাবেই আমাদের সমস্ত মুগ্ধতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে ও সাহিত্যে আমাদের সমস্ত চেষ্টার real হবার, সত্যাশ্রয়ী হবার, সুযোগ ঘটবে।

—Realism কথাটার সঙ্গে বাংলার "তরুণ"রা বেশ পরিচিত। কিন্তু মনে হয় এ কথাটা তাঁরা বুঝতে চাচ্ছেন বেশ খানিকটা বিকৃত করে'। মৃত্যু আমাদের পদে পদে, কিন্তু মৃত্যু real নয়, real জীবন যা মৃত্যুকে ডিঙিয়ে চলে। তেমনি ভাবে মোহ দুর্ব্বলতা মানুষের পদে পদে, কিন্তু তাইই real নয়, real তপস্যা যা মানুষকে সত্যকার মনুষ্যত্ব দান করে। আমাদের দেশের যে খণ্ডিত বিপর্য্যস্ত রুগ্ন জীবন একে real ধরে' নিয়ে নাকি সুরের কান্না-চর্চ্চায় না হয় সাহিত্য-চর্চ্চা না হয় জীবন-চর্চ্চা।

তাজী ঘোড়াকে জীর্ণ আস্তাবলে পোরায় যে বিপদ বাংলার মনীষীদের নব-জীবন ও নব-মানবতার সাধনা বাংলার সমাজ-জীবনে হয়ত সেই বিপদের সূচনা করেছে। কিন্তু সেই ঘোড়া বিদায় দিয়ে জীর্ণ আস্তাবলটি যে অটুট রাখবার চেষ্টা হবে সে সময়ও ত উত্তীর্ণ হয়ে গেছে!

কিন্তু বৃথা এই অস্বস্তিবোধ, বৃথা এই ক্ষোভ। "এক হাতে এর কৃপাণ আছে আর এক হাতে হার"—এই যে আমাদের একালের সাহিত্য এ আমাদের বিভ্রান্ত করতে আসে নাই, এ প্রকৃতই আমাদের সৌভাগ্য। আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক রাষ্ট্রিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ জীবন real করবার বল ও স্বাস্থ্যসমন্বিত করবার সুন্দর করবার অমোঘ শক্তি

এর আছে।—তাই এ যদি এ-কালের বাংলা সাহিত্যিকদের কাছে দাবী করে অকুণ্ঠিত আত্মসমর্পণ, তবে অসম্ভব কিছু দাবী করে না নিশ্চয়ই।

সাহিত্যকে মোটামুটি দুই অংশে ভাগ করে' দেখা যেতে পারে—তার সৃষ্টি-অংশ ও আলোচনা-অংশ। আমরা এতক্ষণ মুখ্যতঃ বুঝতে চেষ্টা করেছি এ-কালের বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি-অংশ, আর তারই সঙ্গে এও দেখা গেছে যে এই সাহিত্যের সমঝদারি, অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের আলোচনা-অংশের এক অংশ, খুবই ত্রুটিপূর্ণ।

কিন্তু শুধু আংশিক ভাবে নয়, বরং মনোযোগ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে সমগ্র ভাবে বাংলা সাহিত্যের আলোচনা-অংশ যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ—জ্ঞান ও উন্নত রুচির এক প্রকৃষ্ট বাহন এ আজো হয়ে ওঠে নাই।

কিন্তু আলোচনা-অংশ এমনি ভাবে ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকলে গৌরবান্বিত সৃষ্টি-অংশেরও যে অনেকখানি ব্যর্থতা,—যেমন বায়ুমণ্ডলের কার্য্যক্ষমতার উপর নির্ভর করে সূর্য্যোত্তাপের সাফল্য। তাই বাংলা সাহিত্যের আলোচনা-অংশ কিসে দোষমুক্ত হতে পারে সেটি বাংলা সাহিত্যিকদের জন্য বাস্তবিকই এক সাহিত্যক সমস্যা। অর্থাৎ, এর উৎকর্ষ বিধানের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত হবার সময় তাঁদের এসেছে।

Matthew Arnold তাঁর একটি লেখায় ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনায় ইংরেজি সাহিত্যের দুটি ত্রুটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেছেন। তাঁর নির্দ্দেশ ইংরেজি সাহিত্যে কতখানি গ্রাহ্য হয়েছে সে বিচারের ভার ইংরেজ সাহিত্যিকদের উপর ন্যস্ত; কিন্তু আমাদের মনে হয়, বাংলার

আলোচনা-অংশের উৎকর্ষের জন্য তাঁর সেই দুটি কথা থেকে প্রচুর সাহায্য পাওয়া যাবে। তাঁর সেই দুটি কথার দিকে বাঙালী সাহিত্যসেবী-মাত্রেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া সঙ্গত। সে দুটি কথার নাম তিনি দিয়েছেন Urbanity ও Clear mind, তার বাংলা অনুবাদ দেওয়া যেতে পারে ভব্যতা ও পরিচ্ছন্ন চিন্তা।

ভব্যতা বলতে তিনি বুঝেছেন গ্রাম্যতা ও আতিশয্য বর্জ্জন; অর্থাৎ, লেখক তাঁর কথাগুলো পেশ করছেন এক শিক্ষিত মণ্ডলীর কাছে, কাজেই তাঁর চিন্তায় ও ভাষায় মার্জ্জিত রুচির পরিচয় থাকবে এইই সমীচীন।—এই ভব্যতা যে আমাদের সাহিত্যে একান্তই বিরল তা নয়। রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ এঁদের রচনায় এর সুন্দর সুন্দর দৃষ্টান্ত চোখে পড়বে। তবু শুধু সাধারণ বাঙালী জীবনে নয় আমাদের শ্রেষ্ঠদের কারো কারো ভিতরেও (যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র) এই ভব্যতার অসদ্ভাব মাঝে মাঝে সেই এক ভাবে ঘাড় বাঁকিয়ে উঠে' জ্ঞান ও রসের আসরে বিভ্রাট ঘটিয়েছে। এই ভব্যতা রচনার শ্রী ও মাধুর্য্য বাড়িয়ে দিয়ে তাকে যে কত অর্থপূর্ণ করে' তোলে তা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একে পুরোপুরি আয়ত্ত করবার ক্ষমতাও হয়ত তাঁরই আছে যিনি প্রেমিক, ও জ্ঞানের পথে অকুতোভয়।

এই ভব্যতা-সাধন বাংলা সাহিত্যিকদের জন্য নিশ্চয়ই খুব সহজ হবে না, কেননা বাংলার প্রচলিত জীবনধারা এর বিপরীত। বাংলার কবি যাত্রা ও একালের থিয়েটার সাংবাদিকতা এ সবের অন্য গুণ যতই থাকুক গ্রাম্যতা ও সংকীর্ণতার প্রাচুর্য্য এসবের বেশ এক বড় পরিচয়-চিহ্ন। কিন্তু কষ্ট-সাধ্য হলেও এ থেকে পেছপাও হওয়ার সময় আমাদের আর নাই। গ্রামের লোক শহরবাসী হলে নাগরিক ভব্যতা আয়ত্ত না

করে’ তার কল্যাণ নাই; আমাদেরও বৃহত্তর জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় এই ভব্যতা সাধনের।

তারপর পরিচ্ছন্ন চিন্তা। শুধু সাহিত্যে নয়, জীবনের সকল ব্যাপারেই এই পরিচ্ছন্ন চিন্তার দাম যে কত বেশী এই বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতার যুগে তা আর নূতন করে’ বলবার দরকার করে না। কিন্তু আমাদের পুরুষপরম্পরাগত গ্রাম্যতার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিচ্ছন্ন চিন্তার এক বড় অন্তরায় হচ্ছে—আমাদের অতীতের মোহ ও বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ভয়।

এই অতীতের মোহ আমাদের মনীষীদের জন্যও অপ্রবল ছিল না সত্য, কিন্তু সেই মোহ তাঁদের চিত্ত বন্দী করে’ রাখতে পারে নাই; রক্ত-মোক্ষণশীল সার ফিলিপ সিড্নীর মতো শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা জয়ী হয়েছেন। আর এক হিসাবে এই মোহ ছিল তাঁদের জীবনের এক অলঙ্কার। কিন্তু অল্পশক্তি লোকদের জীবনে এই মোহ মহা অনর্থ ঘটিয়েছে। আমাদের কত ঐতিহাসিক ও দার্শনিক চিন্তা যে এই মোহের কবলে পড়ে’ অদ্ভুত-দর্শন হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। বাঙালী বাস্তবিকই মুক্ত বুদ্ধির লোক হলে একালের বাঙালীর বহু গবেষণা তার হাসিতামাসার প্রচুর খোরাক যোগাতে পারবে।

কিন্তু এই পিছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে সামনে চলার বিড়ম্বনা বহু ভোগ করা হয়েছে। এ পালা এখন চুকিয়ে দেওয়া ভাল। অবশ্য তার জন্য অতীতকে অস্বীকার করবার দরকার করে না, কেননা তা অজ্ঞানতা। আমরা পিতামাতার সন্তান নিশ্চয়ই।—তবে সেই আমাদের একমাত্র পরিচয় নয়।

আমরা অতীত ইতিহাসের সৃষ্টি;—বেশ। কিন্তু আমাদের পরের যে ইতিহাস তার পূরো চেহারা অতীত থেকে ত অনুমান করা যায় না। এমন কি আমাদের অতীতের সত্য পরিচয় পাবার জন্য প্রয়োজন হয় আমাদের পরের ইতিহাস বুঝবার। অর্থাৎ, আমরা বাস্তবিকই নব নব ইতিহাস সৃষ্টি করি, অথবা আমাদের ভিতর দিয়ে নব নব ইতিহাসের সৃষ্টি হয়। তাই অতীতের বন্ধন আমাদের জন্য অসত্য—মোহ।

এই অতীতের মোহের হাত থেকে উদ্ধার পেলে শুধু সাহিত্যে নয় শিক্ষা স্বাস্থ্য আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ সব বিষয়েই আমাদের চিত্ত যে কত সত্য ও কল্যাণ-অভিসারী হতে পারবে, ভবিষ্যৎ ভীতির স্থল না হয়ে কত মোহন স্বর্গের ধাত্রী হবে, একটু চিন্তা করলেই তা বুঝতে পারা যায়; অথচ এই মোহকে মোহ জেনেও আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের বহু মূল্যবান্ সময় এর পেছনে নষ্ট করি!

উপসংহারে Goethe-র একটি উক্তি উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না—"The great works of art are brought into existence by men, as are the great works of Nature, in accordance with true and natural laws ; all arbitrary phantasy falls to the ground ; ther is Necessity, there is God."—একালের বাংলা সাহিত্যে এই "প্রয়োজন" এই "বিধাতৃ-বিধান" অল্প-বিস্তর আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হয়েছে।—বাঙালী জীবন ও বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এইসব প্রাণপ্রদ জিজ্ঞাসা উত্তরোত্তর আপনাদের গভীরতর চিন্তা-ভাবনার বিষয় হবে, আশা করি।

"মুস্‌লিম সাহিত্য সমাজে"র তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত। চৈত্র, ১৩৩৫

সমাপ্ত

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	১২	উৎসব-আয়োজন করেছে	উৎসব আয়োজন করেছে
৩১	২	মুমূর্ষ	মুমূর্ষু
৪০	৮	সংঙ্কীর্ণ	সঙ্কীর্ণ
৫৬	১৭	হতে	হাতে
৫৯	২৫	অতিরিক্ত	অতিরঞ্জিত
৬২	৭	একথা	এতটা

অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ এম্-এ প্রণীত

অন্যান্য গ্রন্থ।

১। নব পর্য্যায় (প্রথম খণ্ড)—৸০

মুস্তফা কামাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, সাহিত্যে সমস্যা, "মানব-মুকুট," পণ্ডিত সাহেব, কাজি ইমদাদ-উল্-হক স্মরণে, সৃষ্টির কথা, সম্মোহিত মুসলমান, এই কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি।

......এতে মনের জোর, বুদ্ধির জোর, কলমের জোর এক সঙ্গে মিশেছে।........

রবীন্দ্রনাথ

......গ্রন্থখানি সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।...

আনন্দ বাজার পত্রিকা।

২। রবীন্দ্রকাব্যপাঠ (মনোবিকাশের ধারার অনুসরণ)—১।০

......আমার রচনা এমন সরস বিচারপূর্ণ সমাদর আর কারো হাতে লাভ করেছে বলে মনে পড়ে না। এর মধ্যে যে সূক্ষ্ম অনুভূতি ও ভাবানৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে তা বিস্ময়কর। তোমার মতো পাঠক পাওয়া কবির পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়।.........

রবীন্দ্রনাথ।

৩। নদীবক্ষে (উপন্যাস)—১৷৷০

৪। মীর-পরিবার ও অন্যান্য গল্প—১।০